POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

'যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি করিয়া দেন, এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।'

(আল-বাকারা: ২৬২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 32

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার ৯ আগস্ট , 2018 26 যুল কাদা 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

সতর্কতার সহিত পদবিক্ষেপ কর, খুব বিবেচনা করিয়া কাজ কর এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, কারণ তোমরা অজ্ঞ। এমন যেন না হয় যে, তোমরা ন্যায়বানকে অত্যাচারী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া খোদাতালার অপ্রীতিভাজন হও এবং ফলে তোমাদের সমস্ত সৎকাজ পন্ড হইয়া যায়।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

কুরআন শরীফ তোমাদের জন্য বহুল পরিমাণে পবিত্র শিক্ষামালা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তন্মধ্যে একটি শিক্ষা এই যে, তোমরা শিরক হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকিবে কেননা, মুশরেক (অংশীবাদী) নাজাতের উৎস হইতে বঞ্চিত। মিথ্যা বলিবে না, কারণ মিথ্যাও এক প্রকার শির্‌ক।

ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদিগকে একথা বলে না যে, 'না-মাহ্‌রম' (যাহাদের সহিত বিবাহ বৈধ) স্ত্রীলোকের প্রতি শুধু কামলোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইও না, অন্যথায় তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ। বরং এই কথা বলে যে, 'কখনও তাকাইবে না' তাহা কু-দৃষ্টিতেই হউক বা সু-দৃষ্টিতেই হউক; কারণ ইহাতে তোমাদের পদস্খলনের আশঙ্কা আছে। অতএব, 'না-মাহ্‌রম' স্ত্রীলোকদের সম্মুখীন হইবার কালে তোমাদের দৃষ্টি যেন অর্ধ নিমিলীত থাকে এবং তাহাদের আকৃতি সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণাই যেন না জন্মে যেরূপ চক্ষু উঠা রোগের প্রারম্ভে মানুষ ঝাপ্‌সা দেখিয়া থাকে।

ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদিগকে ইহা বলে না যে, এত অধিক সুরা পান করিও না যাহাতে মাতাল হইয়া যাও, বরং এই শিক্ষা দেয় যে, কখনও পান করিও না। কারণ তাহা হইলে খোদাতালা লাভের পথ তুমি পাইবে না, খোদা তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না এবং অপবিত্রতা হইতে তোমাকে পবিত্র করিবেন না। কুরআন শরীফ ইহাও বলে যে, ইহা শয়তানের আবিষ্কার তোমরা ইহা হইতে বাঁচিয়া থাক।

ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদিগকে শুধু একথা বলে না যে, আপন ভাইদের প্রতি অনর্থক রাগান্বিত হইও না; বরং এ শিক্ষা দেয় যে, কেবল নিজের ক্রোধকে দমন করিয়াই ক্ষান্ত হইও না, পরন্তু تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (অর্থাৎ 'একে অপরকে দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়'- সূরা বালাদ ঃ আয়াত ১৮)

আয়াতের আদেশ অনুযায়ী কার্য করিয়া অপরকে তদ্রুপ করিবার উপদেশ দাও এবং কেবল নিজেই দয়া প্রদর্শন করিও না। বরং আপন ভাইগণকেও দয়ালু হইতে উপদেশ দাও। কুরআন শরীফ ইঞ্জিলের ন্যায় তোমাদিগকে একথা বলে না যে, ব্যভিচার ব্যতীত তাহার সকল অপবিত্র আচরণ নীরবে সহ্য কর এবং তাহাকে তালাক দিও না; বরং ইহা এই শিক্ষা দেয় যে, الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ। অর্থাৎ- পবিত্র পুরুষের জন্য পবিত্র বস্তু।

(সূরা নূর- ২৭ আয়াত)

কুরআন শরীফের শিক্ষা এই যে, অপবিত্র -পবিত্রের সাথে থাকিতে পারে না। সুতরাং তোমার স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী না হয় কিন্তু কামলোলুপ দৃষ্টিতে অন্য পুরুষের দিকে তাকায় ও তাহাকে আলিঙ্গন করে, সে কার্যতঃ ব্যভিচারিণী না হইলেও ব্যভিচারের সকল পূর্বাভাস তাহার মধ্যে প্রকাশিত হয়, পর পুরুষের সম্মুখে আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, মুশরেকা (পৌত্তলিকা) এবং মুফসেদা (কলহপ্রিয়) হয়, এবং যে পবিত্র খোদাকে তুমি বিশ্বাস কর তাঁহা হইতে যে বিমুখ হয়, অতঃপর যদি সে এই সকল পাপ কাজ হইতে বিরত না হয় তাহা হইলে তুমি তাহাকে তালাক দিতে পার। কারণ সে কার্যতঃ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সে এখন আর তোমার শরীরের অঙ্গ-স্বরূপ নহে, সুতরাং এখন তাহার সহিত নির্লজ্জের ন্যায় জীবন যাপন করা তোমার জন্য মঙ্গল নয়। কেননা, সে এখন আর তোমর দেহের অংশ নয়, সে এক অপবিত্র ও বিষাক্ত অঙ্গ যাহা ছিন্ন হওয়ার যোগ্য, নতুবা ইহা অবশিষ্ট দেহকেও অপবিত্র ও বিষাক্ত করিয়া দিবে এবং পরিশেষে তুমি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদিগকে একথা বলে না যে, কখনও শপথ করিও না, বরং অনর্থক শপথ নিতে তোমাদিগকে নিষেধ করে। কারণ কোন কোন অবস্থায় শপথ মীমাংসায় পৌঁছিতে সাহায্য করে। প্রমাণের কোন সূত্রকে খোদাতালা নষ্ট করিতে চাহেন না, কেননা ইহাতে তাঁহার হিকমত বিনষ্ট হয়। ইহা স্বাভাবিক যে, যদি কেহ বিচার্য বিষয়ে সত্য গোপন করে তাহা হইলে মীমাংসার জন্য খোদাতালার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। শপথ নেওয়ার মানে হইল খোদাতালাকে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করা।

ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদিগকে একথা বলে না যে, কোন অবস্থায়ই যালেমের প্রতিরোধ করিবে না। বরং এই শিক্ষা দেয় جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ *(সূরা শূরা ঃ আয়াত ৪১)*

অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিদান কৃত অন্যায়ের ঠিক সমপরিমাণ, কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়, ফলে কোনরূপ অমঙ্গল সৃষ্টি না হয় বরং অপরাধীর সংশোধনের কারণ হয়, তাহার প্রতি খোদাতালা সন্তুষ্ট এবং তাহাকে তিনি ইহার জন্য পুরস্কৃত করিবেন।

সুতরাং, কুরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেক ক্ষেত্রে না প্রতিশোধ সুসঙ্গত, না ক্ষমা প্রশংসনীয়; বরং স্থান-কাল-পাত্রভেদে ইহা প্রদর্শন করিতে হইবে যথেচ্ছভাবে নয়। ইহাই কুরআন শরীফের শিক্ষা। কুরআন শরীফ ইঞ্জিলের মত এই কথা বলে না যে, 'আপন শত্রুকে ভালবাস.' বরং এই শিক্ষা দেয় যে, ব্যক্তিগত কারণে যেন কাহারও সহিত শত্রুতা না থাকে এবং সাধারণভাবে

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্টাংশ)

প্রত্যেক দেশে জাতীয় স্তরে এর সদর থাকে এবং স্থানীয় স্তরেও সদর এবং অন্যান্য পদাধিকারীরা থাকে। এরা নিজেদের বৈঠকের আয়োজন করে। এছাড়াও জামাতে সামগ্রিকভাবে যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয় যেখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই অংশ গ্রহণ করে, এমন অনুষ্ঠানেও মহিলাদের জন্য বিশেষ সময় নির্ধারণ করা থাকে। সেখানে তারা নিজেদের বক্তব্য ও বিভিন্ন বিষয় পরিবেশন করে। এছাড়াও সন্তানদের জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য এবং এই ধরণের অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে তারা পরিকল্পনা করে। তাই আমাদের জামাতে মহিলাদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের জামাতে সাক্ষরতার হারের দিক থেকে মহিলারা পুরুষদের থেকে এগিয়ে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার কাছে পূর্ণজ্ঞান না থাকে আপনি সন্তানকে সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা দিতে পারেন না, যা মহিলাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমাদের জামাতের মহিলারা সুশিক্ষিতা। তাদের মধ্যে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আর্কিটেক্টস এবং প্রফেসর। যদিও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও আমাদের মহিলাদের মধ্যে ৯৯.৯ শতাংশ সাক্ষর হিসেবে গণ্য হয়, অপরদিকে পুরুষদের হার মাত্র ৯০ শতাংশ। সাক্ষরতার অর্থ কেবল এই নয় যে আপনি কেবল লিখতে পড়তে জানেন- যেমন পাকিস্তানে সাক্ষরতার মান হিসেবে ধরা হয় যে, আপনি যদি কুরআন পড়তে জানেন তবে সাক্ষর হিসেবে গণ্য হবেন। বরং সাক্ষরতা বলতে অন্ততঃপক্ষে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্জনকে বোঝানো হয়েছে।

এক অধ্যাপক বলেন: বর্তমানে ইউরোপ এক সংকটপূর্ণ সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। কেননা, ইউরোপকে শরণার্থী সংকটের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আপনার মতে ইউরোপের মধ্যে সমন্বিত হতে জামাত আহমদীয়াকে কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি অনেককে প্রায় প্রশ্ন করি যে, আমাকে সমন্বিত হওয়ার সংজ্ঞা বলে দিন। যতদূর জামাত আহমদীয়ার সম্পর্ক, আমার মতে আমরা সঠিকভাবে সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছি, কেননা, আমার মতে সমন্বিত হওয়ার অর্থ হল এই যে, আমাদের দেখতে হবে যেদেশে আমরা বসবাস করছি তার জন্য আমরা কি অবদান রাখছি? যদি আমরা দেশের উন্নতির জন্য নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করছি তবে এর অর্থ হল আমরা সমন্বিত হচ্ছি। ইউরোপে আমাদেরকে বেশ সমীহ করা হয়। ইউরোপে, এখানে সুইডেনে, জার্মানীতে এবং সর্বত্র বিরাট সংখ্যক আহমদী মহিলা এবং পুরুষরা শিক্ষিত আর তাদেরকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করা হয়। তাই ইন্টিগ্রেশন বা সমন্বিত হওয়া সম্পর্কে আমি কোন সমস্যা দেখছি না যার কারণে আমাদের বিচলিত হতে হবে। আপনি যদি শিক্ষিত হন তবে আপনি জানবেন যে আপনার জন্য কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ।

একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, জামাত আহমদীয়ার লক্ষ্য কি? আপনারা কি নিজের কোনও জাতি তৈরী করতে চাইছেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়ার লক্ষ্যই হল পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার স্রষ্টার সামনে নতজানু হয়। যদি এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তবে সেটাই যথেষ্ট। আমাদের কোন জাতি তৈরী করার প্রয়োজন নেই। দেশ দখল করার প্রয়োজন নেই। যদি সমস্ত মানুষ খোদা তা'লাকে চিনতে এবং মানুষের অধিকার প্রদান করতে আরম্ভ করে, তবে প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করার আকাঙ্খা করবে। এই বাণীই প্রসারের কাজেই আমরা নিয়োজিত। সুইডেন, জার্মানী বা অন্য কোন শক্তি নিয়ে আমার লোভ নেই। এই কারণেই জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা নিজের কবিতায় বলেছেন-

'মুঝকো কিয়া মুলকোঁ সে মেরা মুলক হ্যা সব সে জুদা, মুঝ কো কিয়া তাজোঁ সে মেরা তাজ হ্যা রিযওয়ানে ইয়ার।'

অর্থাৎ দেশ নিয়ে আমি করব, আমার দেশ তো সবার থেকে আলাদা, আমি মুকুট নিয়ে করব, বন্ধুর (খোদার) প্রীতিই হল আমার মুকুট।'

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি একথাই বলব যে, জাগতকি শক্তিগুলিকে ইসলাম আহমদীয়াত সম্পর্কে ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা একটি খাঁটি আধ্যাত্মিক জামাত।

আরেক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, আপনার মতে পরকালের বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়ার ফলে ইহকালের প্রতি মনোযোগ কম হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যে এই জগতে এসেছেন তারফলে আপনার উপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে যেগুলি আপনাদেরকে পালন করতে হবে। আপনি যদি এই দায়িত্বগুলি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পালন করে থাকেন তবে এই কাজগুলির প্রতিদান ইহকালেও লাভ করবেন আবার পরকালেও লাভ করবেন। উদাহরণস্বরূপ রসূলে করীম (সা.)-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনি যদি নিজের স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হন, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যদি তার মুখে একটি গ্রাসও তুলে দেন তবে তার প্রতিদান পাবেন। আপনি যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, একে অপরকে ভালবাসেন তবে তার প্রতিদান পরকালেও পাবেন এবং ইহকালেও পাবেন। আপনি যদি নিজের স্ত্রীকে ভালবাসেন তবে পরিবারে শান্তি থাকবে, আপনার সন্তানেরা সুখে-শান্তিতে থাকবে, এছাড়াও আপনি পরকালেও এর প্রতিদান পাবেন। তাই আপনি একথা বলতে পারেন না যে, পরকালের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। কেননা, আপনি যা কিছু করছেন তা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করছেন। আপনার মনোযোগ কেবল পরকালের প্রতি নেই, বরং ইহকালের প্রতিও রয়েছে।

এক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, আপনি সমাজে সমন্বয়ের কথা বলছিলেন- আপনার জামাতের জন্য মানবতার সেবা এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজ করাও কি আবশ্যক?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: অব্যশই জরুরী। আমরা ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চ্যারিটি ওয়াকসের আয়োজন করে থাকি। এর মাধ্যমে সংগৃহিত অর্থ স্থানীয় চ্যারিটির সংগঠনের হাতে তুলে দিই। আমাদের নিজস্ব চ্যারিটি সংগঠনও রয়েছে যার নাম হল হিউম্যানিটি ফার্স্ট।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইউরোপ ছাড়াও আফ্রিকায় আমরা অনেক কাজ করছি। সেখানে আমাদের হাসপাতাল এবং স্কুল প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়াও আমরা আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য জলকূপ খনন করার কাজ শুরু করেছি যাতে তাদেরকে শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা যেতে পারে। আপনি হয়তো নাও জানতে পারেন যে, সেখানে ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় পানির কলসী নিয়ে কয়েক কিমি পথ হেঁটে পানি বয়ে নিয়ে আসে আর সেই পানি আবার নোংরাও হয় যা অনেক রোগ-ব্যাধির কারণ হয়। এছাড়াও আমরা আদর্শ গ্রামও নির্মাণ করছি যার মধ্যে রাস্তায় আলো, পরিস্কার পানীয় জল, কমিউনিটি হল, শাক-সব্জি ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা থাকে। অতএব এই সুযোগ সুবিধাগুলি আমরা সেখানকার স্থানীয় মানুষদের দিচ্ছি।

এক অধ্যাপর প্রশ্ন করেন যে, আফ্রিকার কোন এলাকায় আপনারা এই সব সুযোগ সুবিধা প্রদান করছেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এগুলি হল পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহ। যেমন-ঘানা, নাইজেরিয়া, বুর্কিনাফাসো, মালি, আইভোরিকোস্ট, গ্যাম্বিয়া, সেনেগাল ও প্রমূখ। প্রায় সমস্ত পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে আমরা কাজ করছি। এছাড়াও পূর্ব আফ্রিকার দেশুগলিতেও কাজ করছি। যেমন-কেনিয়া, তানজেনিয়া ইউগেন্ডা ইত্যাদি। সেন্ট্রাল ও দক্ষিণ আফ্রিকা দেশগুলিতে কাজ করছি। কঙ্গো কানসাসাতেও আমাদের বড় জামাত রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহেও কয়েকটি প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমরা গোয়েতামালাতেও একটি বড় হাসপাতাল নির্মাণ করছি।

ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে, এই সমস্ত প্রকল্পের জন্য অর্থ কোথা থেকে আসে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, জামাতের সদস্যরাই আর্থিক কুরবানী করে। এছাড়াও আমরা চ্যারিটি প্রোগ্রামও করে থাকি যার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সম্প্রতি হিউম্যানিটি ফার্স্ট আমেরিকায় একটি ট্রাইএ্যাথলনের আয়োজন করেছিল যার মাধ্যমে ১৫ লক্ষ ডলার সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত অর্থ গোয়েতামালায় নির্মীয়মান হাসপাতাল তৈরীতে খরচ করা হবে।

এরপর ৯ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

বদরী সাহাবা হযরত সুবাই বিন কায়েস, হযরত উনায়েস বিন কাতাদা, হযরত মুলায়েল বিন ওয়বারা, হযরত নওফিল বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত ওয়াদিয়া বিন আমর, হযরত ইয়াযীদ বিনন মুনযের, হযরত খারেজা বিন হুম্মায়ের আশজা, হযরত সুরাকা বিন আমর, হযরত আব্বাদ বিন কায়েস, হযরত আবুয যিয়াহ বিন সাবেত বিন নুমান, হযরত আনাসা, হযরত আবু কাবশা সুলায়েম বিন কাবশা, হযরত মারসাদ বিন আবু মারসাদ, হযরত আবু মারসাদ বিন কুন্নায, হযরত সালিত বিন কায়েস, হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদ, হযরত হুব্বাব বিন মুনযের, হযরত রিফা বিন রাফে রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর জীবানালেখ্য এবং ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

এসব বিষয় এবং মতভেদকে হৃদয়ে স্থান দেওয়ার আমাদের কোন অধিকার নেই। খোদা তা'লার ক্ষমার গণ্ডি অত্যন্ত বিস্তৃত। তাদের সম্পর্কে কিছু বলার পরিবর্তে আমাদেরকে নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং নিজেদের সংশোধন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকি, ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর পুণ্যের ক্ষেত্রে আমরা যেন আরো অধিক অগ্রগামী হই।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৬ জুলাই, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৬ ওফা , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকাল আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করছি। ইতিহাস এবং বিভিন্ন বর্ণনায় কোন কোন সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত এবং ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় কিন্তু অনেকেই এমন আছেন যাদের বৃত্তান্ত খুবই সংক্ষিপ্ত দেখা যায়। যাহোক বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কল্যাণে তাদের যে পদমর্যাদা রয়েছে সেটি নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত, তাই কয়েকটি বাক্যে হলেও তা উল্লেখ হওয়া উচিত। আজ যেসব সাহাবীর কথা উল্লেখ করা হবে তাদের অনেকেই এমন আছেন যাদের কথা খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখকরা হয়েছে।

তাদের মাঝে সর্বপ্রথম রয়েছেন হযরত সুবাই বিন কায়েস বিন আয়শা। কেউ কেউ তার দাদার নাম আবাসা আর কেউ কেউ আয়েশা লিখেছেন। যাহোক তিনি আনসার ছিলেন আর খাযরাজ গোত্রের মানুষ ছিলেন। বদর ও ওহুদের যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন।

(আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৭, সুবাই বিন কায়েস) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৩, সুবাই বিন কায়েস)

তাঁর মাতার নাম খাদিজা বিনতে উমর বিন যায়েদ। আব্দুল্লাহ্ নামে তাঁর এক পুত্র ছিল যার মা বনু জুদারার সাথে সম্পর্ক রাখতেন। সেই পুত্র শৈশবেই ইন্তেকাল করে। এ ছাড়া তাঁর আর কোন সন্তান ছিল না। হযরত উবাদা বিন কায়েস তার ভাই ছিলেন। যায়েদ বিন কায়েস নামেও হযরত সুবাই এর এক ভাই ছিলেন।

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন হযরত উনায়েস বিন কাতাদাহ্। ওহুদের যুদ্ধের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেন তার নাম ছিল আনাস। যাহোক, তার সঠিক নাম হলো উনায়েস। মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং মুহাম্মদ বিন উমর তার নাম উনায়েসই লিখেছেন। বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে তিনি যোগদান করেন এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি শাহদত বরণ করেন। তাঁরও কোন সন্তান ছিল না। এক রেওয়ায়েত অনুসারে ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার সময় খানসা বিনতে খেদাম হযরত উনায়েস বিন কাতাদাহ্র স্ত্রী ছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৩-৩৫৪) (আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৫-৩০৬)

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত মুলায়েল বিন ওবারা। তাঁর নাম সম্পর্কেও ভিন্ন মতামত রয়েছে। ইবনে ইসহাক এবং আবু নঈম তার নাম মুলায়েল বিন ওবারা বিন আব্দুল করীম বিন খালেদ বিন আজলান উল্লেখ করেছেন। অথচ আবু উমর ও কালবী মুলায়েল বিন ওবারা বিন খালেদ বিন আজলান উল্লেখ করেছেন। মাঝখান থেকে আব্দুল করীম বাদ পড়েছে। তিনিও খাযরাজের শাখা বনু আজলান গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

(আসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫১)

যায়েদ এবং হাবীবা তাঁর সন্তান ছিলেন আর তাদের মা ছিলেন উম্মে যায়েদ বিনতে নাযালা বিন মালেক। তাঁর বংশধারা এরপর এগোয় নি।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১৬, মুলায়েল বিন ওবারা)

তাকে খালেদ বিন আজলান বলা হতো। অপর এক বর্ণনা অনুসারে লেখা হয়েছে, বদরসহ অন্য সব যুদ্ধেই তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে ছিলেন।

(আল ইকমাল ফি রাফায়িল আরাতিব আনিল মুতালিফ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২২, নাব মালকান ও মালকান ওয়া বাব মুলায়েল ওয়া মালিক)

অপর এক সাহাবী হলেন নওফেল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন নাযলা। তিনিও ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। কেউ কেউ তাঁর নাম নওফেল বিন সালাবা বিন আব্দুল্লাহ্ বিন নাজলা বিন মালেক বিন আজলান উল্লেখ করেছেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন আর ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তার বংশধারা এগোয় নি।

(আসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৬-৩৪৭) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১৫, মুলায়েল বিন ওবারা)

আরেক সাহাবীর নাম ছিল হযরত ওয়াদিয়া বিন আমর। ইবনে কালবী তাঁর নাম বর্ণনা করেছেন ওয়াদিয়া বিন আমর বিন ইয়াসার বিন আওফ আর আবু মা'শার তাঁর নাম রাফা বিন আমর বিন জারাদ উল্লেখ করেছেন। তিনি বনু জুহায়নার সদস্য ছিলেন, এটি বনু নাজ্জারের মিত্র গোত্র। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। হযরত রবিয়া বিন আমর তাঁর ভাই ছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৭, ওয়াদিয়া বিন আমর)
(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯২)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত ইয়াযিদ বিন মুনযের বিন সারাহ বিন খুন্নাস। তিনি বনু খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন আর উকবার বয়আতে তিনি শামিল ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত ইয়াযিদ বিন মুনযের এবং আমের বিন রাবিয়ার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাঁর ভাই মাকেল বিন মুনযেরও বয়আতে উকবা এবং বদর ও ওহুদের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

(আসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩২, ইয়াযিদ বিন মুনযের ওয়া আখুহু মুয়াকেল)

আরেক সাহাবী হলেন হযরত খারজা বিন হুমায়ের আশজায়ী। তাঁর নাম সম্পর্কেও ইতিহাসে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইবনে ইসহাক তাঁর নাম খারজা বিন হুমায়ের উল্লেখ করেছেন আর মূসা বিন উকবা তাঁর নাম হারেসা বিন হুমায়ের উল্লেখ করেছেন। ওয়াকদী তার নাম হামযা বিন হুমায়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁর পিতার নাম সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ হুমায়ের উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ জুমায়েরা এবং জুমাইয়ের লিখেছে। যাহোক, এবিষয়ে সকলে একমত যে, তিনি আশজা গোত্রের সদস্য ছিলেন আর তারা বনু খাযরাজের মিত্র ছিল। তাঁর ভাইয়ের নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন হুমায়ের আর তিনিও তার সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪৯) (আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭০৪)

এরপর হযরত সুরাকা বিন আমরের উল্লেখ রয়েছে। তিনি আনসারী ছিলেন। সুরাকা বিন আমর বিন আতিয়া বিন হানসা আনসারী অষ্টম হিজরীর জামাদিউল আউয়াল মাসে মুতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর পুরো নাম হলো সুরাকা বিন আমর বিন আতিয়া বিন খানসা আনসারী। তাঁর মায়ের নাম ছিল উতায়লা বিনতে কায়েস। হযরত সুরাকা আনসারের সম্মানিত গোত্র বনু নাজ্জারের সদস্য ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে মহানবী (সা.)-এর হিজরতের কিছুকাল পূর্বে আর কারো কারো মতে মহানবী (সা.)-এর হিজরতের স্বল্পকাল পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) আমরের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস মেহজা এবং সুরাকা বিন আমরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। তিনি বদর, ওহুদ, পরিখা এবং খায়বারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি হুদায়বিয়া এবং উমরাতুল কাজার সময়ও মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত সুরাকা বিন আমর সেই সব সৌভাগ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বয়আতে রিজওয়ানে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তার বংশধারা আর ব্যাহত হয়। আমি যেমনটি বলেছি, ৮ম হিজরীতে মুতার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪) (আল ইসতিয়াব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৫৮০) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৩) (উয়ুনুল আসর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৩)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত আব্বাদ বিন কায়েস। তিনিও ৮ম হিজরীতে মুতার যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। তাঁর নাম সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। তাঁর নাম উবাদা বিন কায়সা বিন আয়শাও পাওয়া যায় আর একইভাবে তাঁর দাদার নাম আবাসাও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। হযরত আব্বাদ হযরত আবু দারদার চাচা ছিলেন। হযরত আব্বাদ বদর, ওহুদ, পরিখা এবং খায়বারে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন আর হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও তিনি যোগ দিয়েছেন। মুতার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৩, আব্বাদ বিন কায়েস)
(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৪, আব্বাদ বিন কায়েস)

এরপর রয়েছেন হযরত আবু যিয়াহ বিন সাবেত বিন নোমান। তিনি ৭ম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এক বর্ণনায় তাঁর নাম উমায়ের বিন সাবেত বিন নোমান বিন উমাইয়া বিন ইমরাউল কায়েস উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে তার নাম নোমান বিন সাবেত বিন ইমরাউল কায়েস। তিনি তাঁর উপনাম বা কুনিয়ত দ্বারা বেশি পরিচিত আর তা হলো আবু যিয়াহ্। বদর, ওহুদ, পরিখা এবং হুদায়বিয়ায় তিনি অংশ নেন আর খায়বারের যুদ্ধের সময় ৭ম হিজরীতে শাহাদত বরণ করেন। বলা হয় যে, এক ইহুদী তাঁর মাথায় আঘাত করে যার ফলে তার মাথা কেটে যায় এবং তিনি শাহদত বরণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৫, আবু যিয়াহ বিন সাবিত)
আসাদুল গাবা, ৬ষ্ঠখণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৫, আবু যিয়াহ বিন সাবিত)

এরপর রয়েছেন হযরত আনসা, তাঁর ইন্তেকালও হয়েছে বদরের যুদ্ধে। কিন্তু এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হযরত আবু বকরের খেলাফত কাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। যাহোক, তিনি মহানবী (সা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত ইথিওপিয়ান দাস ছিল। তার নাম ছিল আনসা আর আবু আনসাও বর্ণিত হয়েছে। কারো কারো মতে তার কুনিয়াত বা উপনাম ছিল আবু মাসরুহ। হযরত আনাসা ইসলামের সূচনাতেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং হিজরতের সময় মদীনায় যান আর হযরত সাদ বিন খায়সামার আতিথ্য গ্রহণ করেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, মহানবী (সা.)-এর সেবায় রত থাকা তাঁর সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ ছিল। তিনি এতটা অনুগত ছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, বসতে গেলেও মহানবী (সা.)এর অনুমতি নিয়ে বসতেন। তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নেন।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০১-৩০২) (সীরাতুস সাহাবা, প্রণেতা মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৮) (আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৩)

এরপর রয়েছেন হযরত আবু কাবশা সোলায়েম (রা.), তার উপনাম হলো আবু কাবশা। হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। কারো কারো মতে তার নাম ছিল সালেমা। তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত পার্সিয়ান দাস ছিলেন। তিনি বদরী সাহাবী, তাঁর জন্ম হয়েছে অওস -এর ভূমিতে। তাঁর দেশ এবং বংশ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কেউ বলে তিনি পার্সিয়ান, কেউ বলে দোসি আর কেউ বলে মক্কী। ইসলামের প্রচারের সূচনাতেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর মদীনায় চলে যান। বদরসহ সকল যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন।

(সীরাস সাহাবা প্রণেতা মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৭৯) হযরত আবু কাবশা যখন মদীনার দিকে হিজরত করেন তখন তিনি কুলসুম বিন আল হেদামের ঘরে অবস্থান করেন। আরেক বর্ণনা অনুসারে তিনি হযরত সাদ বিন খায়সামার কাছে অবস্থান করেন। হযরত উমরের খলীফা মনোনীত হওয়ার আগের দিন হযরত আবু কাবশার ইন্তেকাল হয়। এটি ২২ জমাদিউস সানী, ১৩ হিজরীর কথা।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬)

এরপর রয়েছেন হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ (রা.)। তৃতীয় হিজরী সনের সফর মাসে রাজী নামক স্থানে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিবের মিত্র ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে বদরের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রারম্ভেই তিনি ইসলাম গ্রহণের সম্মান লাভ করেন আর বদরের যুদ্ধের পূর্বেই হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত অওস বিন সামেতের সাথে তার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি সোবল নামক ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হযরত মারসাদ (রা.) সেই সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন যেটিকে মহানবী (সা.) রাজীর দিকে পাঠিয়েছিলেন। এ ঘটনাটি তৃতীয় হিজরী সনের সফর মাসে ঘটে। কারো মতে এই সৈন্যদলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আসেম বিন সাবেত।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫, মারসাদ বিন আবি মারসাদ) (আসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৩)

তাঁর শাহদতের ঘটনার বিবরণ হলো- বনী আজাল এবং কারা গোত্র ইসলাম গ্রহণের ভান করে মহানবী (সা.)-এর কাছে ধর্মীয় শিক্ষা দানের জন্য কয়েকজন মুয়াল্লেম বা শিক্ষক পাঠানোর আবেদন করলে রসূলুল্লাহ্ (সা.), (এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মতভেদ রয়েছে) হযরত মারসাদ বা হযরত আসেম (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি জামা'ত প্রেরণ করেন। তারা রজী নামক স্থানে পৌঁছাতেই বনু হুজায়েল গোত্র নগ্ন তরবারি নিয়ে আসে এবং বলে যে, আমাদের উদ্দেশ্য তোমাদের হত্যা করা নয় বরং তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের কাছ থেকে সম্পদ আহরণ করা। আমরা তোমাদের জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করছি। একথা শুনে হযরত মারসাদ (রা.), খালেদ (রা.) এবং আসেম (রা.) বলেন, তোমাদের অঙ্গীকারের ওপর আমাদের কোন আস্থা নেই আর এভাবে তাঁরা তিন জনই যুদ্ধ করতে করতে জীবন উৎসর্গ করেন।

(সীরাতুস সাহাবা, প্রণেতা মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৫৫)

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত আবু মারসাদ বিন আল হোসেন, গানভী। ১২হিজরী সনে তাঁর ইন্তেকাল হয়। কারো কারো মতে তাঁর উপনাম বা কুনিয়ত ছিল আবু হিস্ন। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইসলামের সূচনাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর মদীনায় আসেন। মহানবী (সা.) হযরত উবাদা বিন সামেতের সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন।

(সীরাতুস সাহাবা, প্রণেতা মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৮১) (আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৫)

হযরত আবু মারসাদ (রা.) এবং তাঁর পুত্র মারসাদ যখন মদীনার দিকে হিজরত করেন তখন উভয়ই হযরত কুলসুম বিন হাদামের কাছে অবস্থান করেন। কারো কারো মতে তারা উভয়েই সাদ বিন হায়সামের ঘরে অবস্থান করেন। হযরত আবু মারসাদ সকল যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫)

ইতিহাসে হযরত আবু মারসাদের যে পদমর্যাদা স্বীকৃত রয়েছে তা হলো, মক্কা বিজয়ের পূর্বে হাতেব বিন আবি বালতাআ যখন স্বীয় স্ত্রী-সন্তানের সুরক্ষার জন্য মক্কাবাসীর কাছে গোপনে একটি পত্রের মাধ্যমে সংবাদ দিতে চান। মহানবী (সা.) বিষয়টি অবগত হন। মহনবী (সা.) কে আল্লাহ্ তা'লা অবহিত

করেন। তিনি (সা.) তিনজন অশ্বারোহীকে সেই মহিলাকে ধরার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে পত্র নিয়ে যাচ্ছিল। এই অশ্বারোহীরা তা উদ্ধার করেন আর এই অশ্বারোহীদের একজন ছিলেন হযরত আবু মারসাদ। হযরত আলী বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) আমাকে এবং আবু মারসাদ গানভী আর জুবায়েরকে প্রেরণ করেন। আমরা ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলাম। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা যাত্রা কর আররৌজায়ে খাখ নামক এক স্থানে পৌঁছার পর তোমরা সেখানে মুশরেকদের এক মহিলাকে পাবে, যার কাছে হযরত আবু বালতাআর পক্ষ থেকে মুশরিকদের নামে একটি পত্র রয়েছে। এটি বুখারীর বর্ণিত রেওয়ায়েত।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, ফাযালা মান শাহাদা বাদরান)

তিনি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। মুসলিম এবং বাগবী ইত্যাদি গ্রন্থে এই হাদীসটি রয়েছে। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমরা কবরের ওপর বসবে না আর কবরের দিকে মুখ করে নামাযও পড়বে না।

(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৫)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফতকালে ১২হিজরীতে ৬৬ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়।

(সীরাতুস সাহাবা, প্রণেতা মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৮১, দারুল ইশাআত করাচি থেকে প্রকাশিত)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত সালীত বিন কায়েস বিন আমর। ১৪ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর পুরো নাম হযরত সালীত বিন কায়েস বিন আমর বিন উবায়েদ বিন মালেক। হযরত সালীত বিন কায়েস এবং হযরত আবু সালমা উভয়েই ইসলাম গ্রহণের পর বনু আদী বিন নাজ্জারের প্রতীমা ভেঙে ফেলেন। মহানবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় পৌছানোর পর তিনি (সা.) যখন উটে বসে মদীনা শহরে প্রবেশ করছিলেন তখন সব গোত্রেরই কামনা ছিল মহানবী (সা.) যেন তাদের ঘরে অবস্থান করেন। সেই সময় মহানবী (সা.)-এর উট যখন বনু আদীর ঘরের কাছে পৌঁছায়। তারা মহানবী (সা.)-এর মামা ছিলেন, কেননা সালমা বিনতে, আমর আব্দুল মুত্তালেবের মা এই গোত্রেরই সদস্য ছিলেন। হযরত সালীত বিন কায়েস আবু সালীত এবং উসায়রা বিন আবি খারেজা উটকে থামাতে চাইলে মহানবী (সা.) বলেন, আমার উটনীকে ছেড়ে দাও, এটি এখন (ঐশী) নির্দেশের অধীনে রয়েছে। অর্থাৎ যেখানে আল্লাহ্ চাইবেন সেখানেই এটি বসে পড়বে। হযরত সালীত বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। জিসার আবি উবায়েদের যুদ্ধে চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমরের খেলাফতকালে তিনি শহীদ হন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৮) [সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃষ্ঠা: ২২৯, হিজরাতুর রাসুল (সা.)]

হযরত মুজযের বিন যিয়াদ (রা.) ওহুদের যুদ্ধে শাহদত বরণ করেন। মুজযের তাঁর উপাধি ছিল, এর অর্থ হলো স্থূল দেহের অধিকারী। মহানবী (সা.) হযরত মুজযের এবং আকেল বিন বুকায়ের এর মাঝে ভ্রতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) হযরত মুজযের এবং হযরত উকাশা বিন মিহসানের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। হযরত মুজযের বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে যোগ দেন।

(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৭২-৫৭৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৮) (উয়ুনুল আসার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩২-২৩৩, ১৯৯৩ সালে বেরুতে দারুল কলম থেকে প্রকাশিত)

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলে করীম (সা.) আবু বখতারিকে হত্যা করতে বারণ করেছিলেন, কেননা মক্কায় সে রসূলে করীম (সা.) কে কষ্ট দেওয়া থেকে মানুষকে বাধা দিয়েছিল। এজন্য মহানবী (সা.) বলেন যে, তাকে হত্যা করবে না।সে নিজেও রসূলে করীম (সা.) কে কোন কষ্ট দিত না আর সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা সেই চুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলযা কুরাইশরা বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবের বিরুদ্ধে করেছিল। হযরত মুজযের আবু বখতারির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, মহানবী (সা.) তোমাকে হত্যা করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আবু বখতারির সাথে তার এক সাথিও ছিল যে তার সাথে মক্কা থেকে বেরিয়েছিল, তার নাম ছিল জানাদা বিন মুলাইহা। সে বনু লাইসের সদস্য ছিল। আবু বখতারির নাম ছিল আস। সে বলে, আমার সাথি সম্পর্কে কী নির্দেশ। হযরত মুজযের বলেন যে, না, আল্লাহ্‌র কসম, তোমার সাথিকে আমরা ছাড়ব না, মহানবী (সা.) শুধু তোমার একার সম্পর্কে আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন। সে বলে, তাহলে মরলে আমরা উভয়েই এক সাথে মরব। এটি আমি সহ্য করতে পারবো না যে, মক্কার মহিলারা বলবে যে, আমি আমার জীবনের খাতিরে বন্ধুকে পরিত্যাগ করেছি। এরপর তারা উভয়ে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আর হযরত মুজযেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হযরত মুজযের তাকে হত্যা করেন। হযরত মুজযের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাকে অতি পিড়াপিড়ি করে বুঝিয়েছি যে, সে যেন বন্দিত্ব মেনে নেয়। আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারতাম কিন্তু সে আমার কথা মানতে প্রস্তুত ছিল না আর অবশেষে সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং আমি তাকে হত্যা করি। (আসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯-৬০) (উয়ুনুল আসার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০১, বাব গাযওয়ায়ে বদর, ১৯৯৩ সালে বেরুতে দারুল কালাম দ্বারা প্রকাশিত)

হযরত মুজযের এর সন্তানরা মদীনায় এবং বাগদাদে বসবাস করত। আবি ওয়াযজা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদের যে তিন শহীদকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল তাঁরা হলেন হযরত মুজযের বিন যিয়াদ, নোমান বিন মালেক এবং আব্দা বিন হাস্‌সাস।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৮)

কিন্তু এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আনীসা বিন আদী মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পুত্র আব্দুল্লাহ্ বদরী সাহাবী, ওহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছেন, আমার পুত্রকে আমি আমার বাড়ির কাছে দাফন করতে চাই যেন তার সাথে আমার নৈকট্য বজায় থাকে। হুযূর (সা.) অনুমতি প্রদান করেন আর এই সিদ্ধান্তও হয় যে, আব্দুল্লাহ্‌র সাথে তাঁর বন্ধু হযরত মুজযেরকেও একই কবরে দাফন করা হবে। অতএব উভয় বন্ধুকে একই কম্বলে আবৃত করে উটে রেখে মদীনায় পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ছিলেন শীর্ণকায় আর মুজযের ছিলেন স্থূলকায়। এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, উটে উভয়ের ওজন সমান মনে হয়েছে, অর্থাৎ যারা উট থেকে নামিয়েছেন তারা দেখেছেন উভয়ের ওজন প্রায় সমান ছিল। মানুষ এতে বিস্ময় প্রকাশ করে তখন মহানবী (সা.) বলেন, উভয়ের নেক কর্ম তাদেরকে সমান করে দিয়েছে।

(আসাদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১, হুব্বাব বিন মুনযির)

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৮)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত হুব্বাব বিন মুনযের বিন জমুহ্। হযরত উমরের খিলাফতকালে তাঁর মৃত্যু হয়। হযরত হুব্বাব বিন মুনযের বদর, ওহুদ, খন্দকসহ বাকি সব যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে তিনি অবিচল থাকেন আর মৃত্যুর শর্তে তাঁর হাতে বয়আত করেন।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৬৫, হুব্বাব বিন মুনযির) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৮)

তাঁর সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন যে, যে জায়গায় ইসলামী সৈন্য বাহিনী ছাউনি স্থাপন করে তা তেমন কোন ভালো জায়গা ছিল না, তখন হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, এটি কি আপনি ঐশী ইলহামের অধীনে পছন্দ করেছেন নাকি সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে এমনটি করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, এ সম্পর্কে কোন ঐশী নির্দেশ আসে নি, তুমি কোন পরামর্শ দিতে চাইলে দিতে পার। তখন হযরত হুব্বাব বিন মুনযের নিবেদন করেন, তাহলে আমার মতে এই জায়গা উপযুক্ত নয় বরং সামনে অগ্রসর হয়ে কুরাইশের নিকটবর্তী ঝর্ণার নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেওয়া উত্তম হবে। আমি এই ঝর্ণা সম্পর্কে জানি, এর পানিও ভালো আর সাধারণত যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। মহানবী (সা.) এই প্রস্তাব পছন্দ করেন। যেহেতু তখনো কুরাইশরা টিলার বিপরীত দিকে ছাউনি স্থাপন করেছিল আর এ ঝর্ণা খালি ছিল, তাই মুসলমানরা এগিয়ে গিয়ে ঝর্ণার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কিন্তু কুরআনে যেভাবে ইঙ্গিত রয়েছে তখন সেই ঝর্ণায় পানিও তেমন বেশি ছিল না, মুসলমানরা পানির অভাব বোধ করছিল আর এছড়াও উপত্যকার যে পাশে মুসলমানরা ছিল, সেটিও খুব ভালো জায়গা ছিল না, কেননা এ অংশে অনেক বেশি বালি ছিল যে কারণে পা ঠিকমত দাঁড়াত না। এরপর আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, কিছু বৃষ্টি হয় আর এর ফলে মুসলমানেরা চৌবাচ্চার মত বানিয়ে পানি জমা করার সুযোগ পায়। আরএ সুবিধাও লাভ হয় যে, বালি শক্ত হয়ে যায় এবং পা বালিতে গেঁথে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। অপর দিকে কুরাইশদের অংশের জায়গা কর্দমাক্ত হয়ে যায় আর সে দিকের পানিও কিছুটা ময়লা ও ঘোলাটে হয়ে যায়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ- পৃষ্ঠা: ৩৫৬-৩৫৭)

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, হযরত জিবরাইল মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হন এবং বলেন, হযরত হুব্বাব বিন মুনযের যে রায় দিয়েছেন

তা সঠিক। মহানবী (সা.) বলেন, হে হুব্বাব! তুমি বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছ। বদরের যুদ্ধে খাযরাজ গোত্রের পতাকা হযরত হুবাব্ব বিন মুনযেরের হাতে ছিল। হযরত হুব্বাব বিন মুনযের যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ৩৩ বছর ছিল।

(আততাবকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০)

তাঁর সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে আরো লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) যখন তাঁর গুপ্তচরদের পক্ষ থেকে কুরাইশ বাহিনীর এগিয়ে আসার সংবাদ পান তখন তিনি তাঁর এক সাহাবী হযরত হুব্বাব বিন মুনযেরকে প্রেরণ করেন শত্রু বাহিনীর সংখ্যা এবং শক্তি সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য। তিনি তাকে তাকিদপূর্ণ নসীহত করে বলেন যে, শত্রু যদি বেশি শক্তিশালী হয় এবং মুসলমানদের জন্য আশঙ্কার কারণ হয় তাহলে ফিরে এসে বৈঠকে এটি বলবে না যে, তাদের সংখ্যা অনেক বেশি বরং পৃথকভাবে অবহিত করবে যেন মুসলমানদের মাঝে কোন প্রকার ভীতির সঞ্চার না হয়। হুব্বাব গোপনে গোপনে যান এবং খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে স্বল্পসময়ে ফিরে এসে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে মহানবী (সা.) কে অবহিত করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ- পৃষ্ঠা: ৪৮৪)

ইয়াহিয়া বিন সাদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) যখন কুরাইজা এবং নজীরের যুদ্ধের সময় মানুষের কাছে পরামর্শ চান তখন হযরত হুব্বাব বিন মুনযের দণ্ডায়মান হন এবং নিবেদন করেন যে, আমার মতামত হলো আমাদেরকে তাদের মহল্লার নিকটতম স্থানে ছাউনি স্থাপন করা উচিত (যেন সেখানকার সব কথা অবগত হওয়া যায় এবং সঠিকভাবে নিগরানীও করা সম্ভব হয়।) মহানবী (সা.) তার পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। হযরত উমরের খিলাফতকালে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৭-৪২৮)

রসূলে করীম (সা.)-এর যখন ইন্তেকাল হয় তখন মুসলমানদের যে পরিস্থিতি ছিল তা হযরত আবু বকর (রা.) তা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন সেই ঘটনা হলো- হযরত আবু বকর আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করেন এবং বলেন যে, দেখ! যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পূজা করত তাদের কান খুলে শোনা উচিত নিঃসন্দেহে রসূলে করীম (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, আর যারা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করত তাদের স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্তা'লা জীবিত আর তিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না। এর পরে হযরত আবু বকর إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ -এ আয়াত পড়েন। অর্থাৎ তোমরাও মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। তারপর তিনি এ আয়াতও তেলাওয়াত করেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَائِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) কেবল একজন রসূল, তাঁর পূর্বের সকল রসূল ইন্তেকাল করেছেন, অতএব তিনি (সা.)ও যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালিতে বা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে? যে নিজের গোড়ালিতে ফিরে যাবে, সে কখনোইআল্লাহ্র ক্ষতি করতে পারবে না আর অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৫)

সোলেমান বলেন, এটি শুনে মানুষ এতটা কেঁদেছে যে, মানুষ ফুঁপিয়ে ওঠতে শুরু করে। সোলেমান বলেন, আনসাররা বনী সাআদার বাড়িতে হযরত সাদ বিন উবাদার কাছে একত্রিত হয়ে বলেন, একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে এবং আরেকজন তোমাদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হোক। হযরত আবু বকর, হযরত উমর বিন খাত্তাব এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ তাদের কাছে যান হযরত উমর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হযরত আবু বকর তাদেরকে নীরব থাকতে বলেন। হযরত উমর বলতেন যে, খোদার কসম! আমি যা কিছু বলতে চাচ্ছিলাম তার জন্য আমি আমার পছন্দমত বক্তৃতা প্রস্তুত করেছিলাম, আমার আশঙ্কা ছিল যে, হযরত আবু বকর সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন না, অর্থাৎ সেইভাবে কথা বলতে পারবেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বক্তৃতা করেন আর এমন বক্তৃতা করেন যা বাগ্মীতায় সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। তিনি বক্তৃতায় এটিও বলেন যে, আমরা আমীর আর তোমরা হলে উজির বা সাহায্যকারী। হুব্বাব বিন মুনযের এটি শুনে বলেন যে, মোটেই নয়। এই কথাটির উল্লেখ এই জন্য করছি যে, এখানে হুব্বাব বিন মুনযেরের উল্লেখ হয়েছে। হুব্বাব বিন মুনযের এটি শুনে বলেন, মোটেই নয়, আল্লাহ্র কসম, মোটেই নয়। খোদার কসম আমরা এমনটি করব না বরং আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন আর একজন আপনাদের মধ্য থেকে হবেন। অর্থাৎ একজন কুরাইশ থেকে এবং আরেকজন আনসারদের মধ্যে থেকে হবে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন যে, না বরং আমীর আমরা আর উজির তোমরা। কেননা বংশমর্যাদায় পুরো আরবের মাঝে আমরাই সবচেয়ে সম্মানিত আর বংশধারায় আমরা প্রাচীন আরব, তাই তোমরা উমর বা আবু উবায়দার হাতে বয়আত কর। হযরত উমর বলেন যে, না আমরা তো বরং আপনার হাতে বয়আত করব কেননা আপনি আমাদের নেতা এবং আমাদের চেয়ে উত্তম আর মহানবী (সা.)-এর কাছে আপনি আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন। একথা বলে হযরত উমর হযরত আবু বকরের হাত ধরেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করেন আর মানুষেরাও তাঁর হাতে বয়আত করে। তখন সবাই তার হতে বয়আত করেন।

[সহী বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েলু আসহাবিন নাবী (সা.)]

হযরত হুব্বাব বিন মুনযেরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে আসেন এবং নিবেদন করেন যে, এই দুটি কথার মাঝে কোনটি আপনার কাছে বেশি পছন্দনীয়? একটি হলো পৃথিবীতে আপনার নিজ সাহাবীদের সাথে বসবাস করা আর অপরটি হলো আপনার প্রভুর দিকে সেই প্রতিশ্রুতিসহ ফিরে যাওয়া অর্থাৎ নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে স্থায়ী নেয়ামতের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা আপনি পছন্দ করেন এবং যার মাধ্যমে আপনার নয়ন স্নিগ্ধ হবে। তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের পরামর্শ কী? সাহাবীরা বলেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা এটিই বেশি পছন্দ করব যে, আপনি আমাদের সাথে থাকবেন আর আমাদেরকে আমাদের শত্রুর দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবেন যেন তিনি তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেন আর আপনি আমাদেরকে ঐশী সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করবেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত হুব্বাব বিন মুনযেরের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার কী হয়েছে যে, তুমি কিছুই বলছ না? নীরবে বসে আছ। তিনি বলেন, আমি তখন নিবেদন করলাম যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার প্রভু আপনার জন্য যা পছন্দ করেছেন আপনি সেটিই অবলম্বন করুন। অতএব তিনি আমার কথা পছন্দ করলেন।

(আলমুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮৩, পুস্তক-মারেফাতুস সাহাবা যিকরু মানাকিবুল হুব্বাব বিন মুনযের, হাদীস-৫৮০৩)

আরেকজন সাহাবীর নাম হলো হযরত রিফা বিন রাফে বিন মালেক বিন আজলান। তিনিও একজন আনসার সাহাবী ছিলেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়ার এমারতের প্রারম্ভিক দিনগুলোতে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত রেফা বিন রাফে বিন মালেক বিন আজলানের উপনাম আবু মাআয। তাঁর মা হলেন উম্মে মালেক বিনতে উবাই বিন সুলুল যিনি মুনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সুলুল-এর বোন ছিলেন। তিনি উকবার বয়আতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বদর, ওহুদ এবং খন্দক আর বয়আতে রেজওয়ানসহ সব যুদ্ধেই তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তাঁর দুই ভাই ছিল, খিল্লাদ বিন রাফে এবং মালেক বিন রাফে, এরাও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

(আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৯, হুব্বাব বিন মুনযির) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪৭, রিফা বিন রাফে)

হযরত মাআজ তাঁর পিতা হযরত রেফা বিন রাফের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন আর তাঁর পিতা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, জিবরাঈল মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আপনি মুসলমানদের মাঝে বদরের যুদ্ধে যোগদানকারীদের কী মর্যাদা দেন? মহানবী (সা.) বলেন, সর্বোত্তম মুসলমান বা এমনই কোন শব্দ বলেছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, একইভাবে সে সমস্ত ফেরেশতারাও শ্রেষ্ঠ যারা বদরের যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব শুহুদুল মালায়েকা বাদরান)

ফেরেশতারা কীভাবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন? এ সম্পর্কে হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন শাহ্ সাহেব বুখারীর ব্যাখ্যায় ফেরেশতাদের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার যে ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন তা হলো- আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন,

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

অর্থাৎ এটি সেই সময় ছিল যখন তোমার প্রভু ফেরেশতার প্রতিও ওহী করছিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। অতএব মু'মিনদেরকে দৃঢ়চিত্ত কর আর কাফেরদের হৃদয়ে আমি ত্রাস সৃষ্টি করব। হে মু'মিনেরা! তোমরা তাদের ঘাড়ে হামলা কর এবং তাদের প্রতিটি আঙ্গুলে আঘাত হান। 'জারবুল

আনাক', 'জারবুর রিকাব' এবং'জারবু কুল্লা বানান'–এর অর্থ হলো জোরালো হামলা যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাতের অর্থ রয়েছে। এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুই তিনটি রেওয়ায়েত আছে আর এ সম্পর্কে শাহ্ সাহেব বলেন, এই অধ্যায়ে যে সমস্ত হাদীস রয়েছে তাতে ফেরেশতাদের উপস্থিতি আর ফেরেশতা চোখে পড়ার বিষয়টি আসলে দিব্যদর্শন, অর্থাৎ দিব্যদর্শনরূপে হয়েছে আর তাদের যুদ্ধও তেমনই যা তাদের অবস্থা সম্মত। (অর্থাৎ ফেরেশতাদের অবস্থা সম্মত যুদ্ধ) সেটি তীর বা তরবারির যুদ্ধ নয়। (ফেরেশতারা তীর ও তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করে নি।) তাদেরকে আধ্যাত্মিক চোখে দেখা যায়, চর্ম চোখে নয়। মহানবী (সা.)ও দেখেছেন, আর সাহাবীরাও এবং আল্লাহ্‌র ওলীরাও সেভাবেই দেখে থাকেন (ফেরেশতারা কীভাবে যুদ্ধ করে) এই বিষয়টি আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। শাহ্ সাহেব ব্যাখ্যা করেন যে, কুরাইশের শীর্ষ নেতৃত্বরা নাখলার ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে মেজাজ হারিয়ে ফেলে। এই ঘটনাই পরবর্তী যুদ্ধগুলোর কারণ হয় যাতে কুরাইশের কাফেরদের ধ্বংস সংক্রান্ত ঐশী তকদীর পূর্ণতা লাভ করে। ফেরেশতাদের কর্মপন্থা আমাদের কর্মপন্থা থেকে পৃথক আর তাঁদের যুদ্ধের রীতি আমাদের যুদ্ধ রীতি থেকে ভিন্ন। বদরের প্রান্তরে শত্রুদের বালির টিলায় ছাউনি স্থাপন করা এবং মহানবী (সা.)-এর নিচের উপত্যকায় ছাউনি স্থাপন আর স্বল্প সংখ্যক সাহাবী শত্রুদের দৃষ্টির আড়ালে থাকা, এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া, সাহাবীদের প্রত্যেকটি তীরের সঠিক লক্ষ্যে আঘাত হানা, (সাহাবীরা যে তীরই ছুড়তেন সঠিক লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত হানত) এবং কার্যকরী হওয়া, শত্রুর মাঝে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার হওয়া, সাহাবীদের দৃঢ়চিত্ততা, (শত্রু দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিল আর সাহাবীরা দৃঢ়চিত্ত হয়ে এবং অবিচলতার সাথে যুদ্ধ করছিলেন।) তিনি বলেন, এই সব কিছুই ফেরেশতাদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। যার সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) কে নিম্নলিখিত শব্দে দিয়েছিলেন,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.

অর্থাৎ সেই সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে মিনতি করতে। তখন তোমাদের প্রভু তোমাদের দোয়া শুনেন এবং বলেন যে, আমি সহস্র সহস্র ফেরেশতার মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করব যারা দলের পর দল এগিয়ে আসবে। (সূরা আনফাল, আয়াত: ১০) তিনি লিখেন যে, মহানবী (সা.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার ফলে বাহ্যিক উপকরণে যে গতির সঞ্চার হয় তাতে এক বিস্ময়কর ধারাবাহিকতা দেখা যায়। এর প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ফেরেশতাদের এক বিশাল বাহিনীকে কর্মরত দেখা যায়। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)কে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে নিরাপদে মক্কা মুকার্‌রমা থেকে কে বের করেছে? কে মক্কাবাসীদের উদাসীন রেখেছে, কে তাদেরকে 'সওর' গুহা পর্যন্ত এনে মহানবীর পিছু ধাওয়া থেকে কুরাইশদেরকে নিরাশ অবস্থায় ফেরত পাঠিয়েছে আর কে মহানবী (সা.)কে নিরাপদে মদীনা মুনওয়ারায় পৌঁছে দিয়েছে যা ইসলামের উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়েছে?

পুনরায় লিখেন, হিজরতের পর হযরত আব্বাস (রা.)-এর মক্কায় মুশরেক অবস্থায় অবস্থান করা এবং রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা পোষণ করা আর তাঁকে মদীনা মুনওয়ারায় কুরাইশের ষড়যন্ত্র এবং দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করা (অর্থাৎ হযরত আব্বাসের মাধ্যমে) এটিও ফেরেশতাদের বিষয় নিয়ন্ত্রণের একটি অংশ। (ফেরেশতারা এভাবেই কাজ করে।) এসব ঘটনার পিছনে ফেরেশতাদের প্রেরণাই কাজ করে। রসূলে করীম (সা.)-এর বিভিন্ন যুদ্ধ এবং যুদ্ধে বিজয়ের পটভূমি ঈমান উদ্দীপক আয়াত 'আন্নি মুমিদ্দুকুম বেআলফেম মিনাল মালায়েকাতে মুরদেফীন'–এরই তফসীর উপস্থাপন করে।"

এরপর শাহ্ সাহেব আরো বলেন, "আমি বুখারী শরীফ পুরোটাই হযরত খলীফা আউয়াল হযরত মওলানা নুরুদ্দীন (রা.)-এর কাছে একেকটি পাঠ হিসেবে পড়েছি। একইভাবে কুরআন করীমও দরসে বেশ কয়েকবার শুনেছি এবং পড়েছি। তিনি অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ফেরেশতা সম্পর্কে বলতেন, নুরুদ্দীনেরও আল্লাহ্ তা'লার ফেরেশতাদের সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ হয়েছে। ফেরেশতাদের কর্মজগৎ অত্যন্ত বিস্তৃত জগৎ। মানুষের শক্তিবৃত্তি ও যোগ্যতার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য ও গুণকে কাজে নিয়োজিত রাখার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। মানুষের দৃষ্টি শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের শ্রবণ শক্তি ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়, মানুষের স্পর্শ করার ও ধরার শক্তি, বিবেক ও বুদ্ধি এবং চিন্তাভাবনার শক্তির সাথে যদি ফেরেশতার সাহায্য ও সমন্বয় না হয় তাহলে এসব শক্তি অর্থহীন এবং ক্ষতিকর হয়ে যায়। (সমস্ত মানবীয় শক্তিসামর্থ্য ও শক্তিবৃত্তি ফেরেশতার কারণেই কার্যকর হয়ে থাকে।) তিনি বলেন, তীর ও গুলির লক্ষ্যে আঘাত হানা বা না হানা তখনই সঠিক হতে পারে যদি মানুষের বিবেকবুদ্ধি সঠিকভাবে কাজ করে এবং দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা সঠিক থাকে আর কাণ্ডজ্ঞান সঠিক থাকে, চিন্তাশক্তি সঠিকভাবে কাজ করে, নতুবা তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। তিনি বলেন, খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, এক একটি মানসিক এবং দৈহিক শক্তির পিছনে ফেরেশতা নিযুক্ত আছে আর এর সম্পর্ক প্রতিটি মানুষের প্রতিটি শক্তির সাথে। ঈমান ও কুফরের বিভিন্ন অবস্থার নিরিখে এতে তারতম্য হয়। কুরআনে বদরের প্রেক্ষাপটে এদের সংখ্যা তিন হাজার আর ওহুদের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার বলা হয়েছে। এ পার্থক্য হয়েছে স্থান ও কাল ও গুরুত্ব ভেদে। বদরের যুদ্ধে শত্রু সংখ্যা কম এবং ওহুদের সময় শত্রু সংখ্যা বেশি আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে আশঙ্কাও বেশি ছিল এবং ফেরেশতার সুরক্ষাও বেশি সংখ্যায় নাযিল করার প্রতিশ্রুতি ছিল। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (আলে ইমরান, আয়াত-১২৭) অর্থাৎ প্রতিশ্রুত ঐশী সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ খোদার বৈশিষ্ট্য আযীযিয়্যত এবং হাকীমিয়্যত– এই উভয় বৈশিষ্ট্যই সুষ্ঠ পরিকল্পনা, পূর্ণ আধিপত্য এবং দৃঢ়তার দাবি রাখে যাতে সাহায্যের উপকরণের প্রতিটি আঙ্গিকে একটি অন্যটির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকে। এতে ধারাবাহিকতা ও দৃঢ়তা পাওয়া যায় আর তা সুদৃঢ় ঐশী পরিকল্পনার মাধ্যমে দৃঢ় ও মজবুত করা হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী থেকে সংকলিত)

এই হলো সেই গভীর জ্ঞানগর্ভ বিষয় যা ফেরেশতাদের যুদ্ধ করা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, ফেরেশতা পাঠানো হয়েছে, যারা যুদ্ধে রত ছিল। এটি এমন নয় যে, ফেরেশতারা নিজে কাউকে আঘাত করছিল। কারো কারো মতে রেওয়ায়েতে এটিও উল্লেখ আছে যে, ফেরেশতা যাদেরকে হত্যা বা আঘাত করেছে তাদের চিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল আর সাহাবীদের মাধ্যমে যারা আহত হচ্ছিল তাদের আঘাতের ধরন ভিন্ন।

(ফাতহুল বারী, শারহি সহী আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

এটি ভ্রান্ত ধারণা। মূল বিষয় হলো- ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে যখন মানবীয় শক্তি বৃত্তিকে সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া ও তাদেরকে সঠিকভাবে পথ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে তখন এটিকেই ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করা বোঝায়।

হযরত ইয়াহিয়া (রা.) হযরত মাআয বিন রাফার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত রাফা (রা.) আর তাঁর পিতা হযরত রাফে (রা.) উকবার বয়আতকারীদের একজন ছিলেন। হযরত রাফে (রা.) তাঁর পুত্র হযরত রাফাকে বলতেন, আমার জন্য উকবায় বয়আত করার চেয়ে বদরের যুদ্ধে যোগদান বেশি আনন্দ ও সম্মানের কারণ। আমি মনে করি বদরের যুদ্ধে যোগদান করে আমি এক বিশেষ সম্মান লাভ করেছি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

হযরত রাফা বিন রাফে জামাল এবং সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত জুবায়ের (রা.) যখন বসরার দিকে সৈন্য বাহিনীর সাথে বের হন তখন হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালেবের স্ত্রী উম্মুল ফযল বিনতে হারেস হযরত আলী (রা.)-কে তাদের বের হওয়ার সংবাদ দেন। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো, মানুষ হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর হামলা করে তাঁকে শহীদ করেছে আর কোন জোরজবরদস্তি ছাড়াই তারা আমার হাতে বয়আত করেছে। অর্থাৎ আমি বয়আত করার জন্য জোর করি নি। মানুষ আমার হাতে বয়আত করেছে। তালহা এবং জুবায়েরও আমার হাতে বয়আত করেছে আর এখন তারা সৈন্য বাহিনীসহ ইরাকের দিকে যাত্রা করেছে। এই প্রেক্ষিতে হযরত রাফা বিন রাফে বলেন, মহানবী (সা.) এর যখন ইন্তেকাল হয় তখন আমাদের ধারণা ছিল যে, আমরা অর্থাৎ আনসাররা এই খিলাফতের বেশি যোগ্যতা রাখি কেননা আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সাহায্য করেছি আর আমাদের পদমর্যাদা ধর্মের দিক থেকে বড়, কিন্তু আপনারা বলেছেন, আমরা হিজরতকারীরা সর্বপ্রথম আর আমরা মহানবী (সা.)-এর বন্ধু এবং কাছের মানুষ। আমরা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করাই যে, তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়ে আমাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না আর তোমরা এটাও খুব ভালোভাবে জান যে, আমরা তখন খিলাফতের বিষয়টি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমরা কোন বিতর্ক করি নি আর আমরা খলীফার হাতে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে বয়আত করেছি। এর কারণ ছিল, আমরা যখন দেখলাম যে, সত্যের ওপর আমল হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কিতাবের অনুসরণ করা হচ্ছে আর মহানবী (সা.) এর সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তখন আমাদের কাছে মেনে নেওয়া ছাড়া আর সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এটি ছাড়া আমাদের আর চাওয়ারই বা কী ছিল আর আমরা আপনার হাতে বয়আত করেছি আর এটি থেকে আমরা পশ্চাদপদ হইনি। আর এখন আপনার বিরুদ্ধে তারা বিরোধিতা করছে যাদের চেয়ে আপনি উত্তম এবং

বেশি পছন্দনীয়। অতএব আপনি আমাদেরকে আপনার নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন হুজ্জাজ বিন আনসারী আসেন এবং বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই এ বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত। মৃত্যুকে আমি যদি ভয় করি তাহলে আমার হৃদয় কখনো প্রশান্তি পাবে না । হে আনসার গোত্র! আমীরুল মু'মিনীনের পুনরায় সাহায্য কর, যেভাবে প্রথমবার মহানবী (সা.) কে সাহায্য করেছিলে। আল্লাহ্ তা'লার কসম! এই দ্বিতীয় সাহায্য প্রথম সাহায্যের ন্যায় হবে যদিও দুই সাহায্যের মাঝে প্রথম সাহায্য অবশ্যই শ্রেয়।

(আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮১, রিফা বিন রাফে)

যাহোক, তাঁর ইন্তেকাল হযরত আমীর মুয়াবিয়ার এমারতের প্রথম দিকে হয়।

(আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯৭, রিফা বিন রাফে)

এই ছিল সাহাবাদের স্মৃতিচারণ। গত খুতবার বরাতেও আমি একটি ঘটনার আরো কিছুটা বিশদ ব্যাখ্যা দিতে চাই। হযরত আম্মার সম্পর্কে বলেছিলাম যে, হযরত আমার বিন আল আস তাঁর মৃত্যুর পর অত্যন্ত আক্ষেপ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন কেননা মহানবী (সা.) কে তিনি এটি বলতে শুনেছেন যে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে বিদ্রোহী শ্রেণি হত্যা করবে, হযরত আমার বিন আস এই কারণেও সংশয়ে ছিলেন যে, তিনি আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষে ছিলেন আর হযরত আম্মারকে শহীদ করেছিল হযরত আমীর মুয়াবিয়ার সৈন্যরাজি।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭৪)

এই বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন যে, এরা যেহেতু বিদ্রোহী শ্রেণি ছিল, তাই তাদের নাম কেন এত সম্মানের সাথে নেওয়া হয় আর হযরত আমীর মুয়াবিয়াকে জামা'তের বই পুস্তকেও একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রথম কথা হলো, সাহাবীদের এক পদমর্যাদা রয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে আমাদের একথা বলার অধিকার নেই যে, ইনি ক্ষমা পাবেন আর ইনি ক্ষমা পাবেন না। যার ভুল বুঝাবুঝি বা ভুলের কারণে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে, তার পরিণতি মুসলমানরা দেখেছে। এই প্রশ্ন তাদের মাথায়ও আসত যারা সেই যুগে বসবাস করতেন, এরপর তারা নিজেদের অস্বস্তি দূর করার জন্য দোয়াও করতেন যে, হে আল্লাহ্! এটি কীহলো, ইনিও সাহাবী আর তিনিও সাহাবী অথচ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। আল্লাহ্‌র কাছে হয়ত তারা দিক নির্দেশনাও চেয়েছেন আর খোদা তা'লা তাদেরকে পথ নির্দেশনা দিতেনও।

এমন একটি ঘটনা আবু যুহা বর্ণনা করেন, আমর বিন শারাহবিল আবু মায়সারা (যিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদের যোগ্য ছাত্রদের একজন ছিলেন,) তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, একটা সবুজ শ্যামল বাগান, তাতে কয়েকটি তাবু খাটানো ছিল, তাদের মাঝে হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরও ছিলেন। আরো কয়েকটি তাবু ছিল, যাতে ছিল যুলকালা। আবু মায়সারা জিজ্ঞেস করেন যে, এটি কীভাবে সম্ভব হলো, এরা তো পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিল, উত্তর আসে যে তারা আল্লাহ্ তা'লাকে অনেক বড় ক্ষমাশীল পেয়েছেন, তাই তারা এখন সেখানে সমবেত হয়েছেন।

(আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০২)

অতএব এ বিষয়গুলো এখন খোদা তা'লার হাতে ন্যাস্ত। এসব বিষয় এবং মতভেদকে হৃদয়ে স্থান দেওয়ার আমাদের কোন অধিকার নেই। এইসব বিষয় হৃদয়ে লালন করার কারণে এবং যুদ্ধের কারণেই মুসলমানদের মাঝে আন্তরিক দূরত্ব এবং ভেদাভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর এর কুফল আজও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এই বিষয়গুলো আমাদের জন্যও শিক্ষনীয় বিষয়, এসব কথা হৃদয়ে লালন করার পরিবর্তে ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হোন। একবার হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর বরাতে আমি যখন হযরত আমীর মুয়াবিয়ার কোন ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম, তখন আরব দেশগুলোর কোন একটি দেশ থেকে কেউ আমাকে লিখেছিলেন যে, তিনি তো বিদ্রোহী এবং হত্যাকারী দলের নেতা ছিলেন, তাকে কেন এত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। স্বপ্ন সংক্রান্ত এই যে রেওয়ায়েতটি রয়েছে তা উত্তরস্বরূপ তাদের জন্য যথেষ্ট যে, খোদা তা'লার ক্ষমার গণ্ডি অত্যন্ত বিস্তৃত। তাদের সম্পর্কে কিছু বলার পরিবর্তে আমাদেরকে নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং নিজেদের সংশোধন করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও কোন কোন জায়গায় হযরত আমীর মুয়াবিয়ার প্রেক্ষাপটে প্রশংসনীয় কথা বলেছেন।

(মালায়েকুতুল্লাহ্, আনওয়ারুল উলুম, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৫২ থেকে সংগৃহিত)

অতএব আমাদেরও সেই সব সম্মানিত বুযুর্গের ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করার পরিবর্তে এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। হযরত আমীর মুয়াবিয়া সম্পর্কে এক জায়গায় এই ঘটনাও উল্লিখিত রয়েছে যে, হযরত আলী এবং তাঁর মাঝে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল আর মতভেদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখনকার খ্রিষ্টান বাদশাহ ভাবল যে, মুসলমানদের অবস্থা দুর্বল, তাই হামলা করা উচিত। হযরত আমীর মুয়াবিয়া যখন এটি জানতে পারেন, তখন তিনি বলেন, তোমার ধারণা যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে স্মরণ রেখো যে, তুমি যদি মুসলমানদের ওপর হামলা কর তাহলে হযরত আলীর পতাকাতলে যুদ্ধকারী সর্বপ্রথম জেনারেল আমি হব, যে তাঁর পক্ষ থেকে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩০ থেকে সংকলিত)

তাই বিবেক বুদ্ধি খাটাও। যাহোক, এটিও ছিল তাদের আরেকটি পদমর্যাদা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকি, ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর পুণ্যের ক্ষেত্রে আমরা যেন আরো অধিক অগ্রগামী হই।

*****❖*****❖*****❖*****

১ম পাতার শেষাংশ....

সকলের প্রতিই তুমি সহানুভূতিশীল হও। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার খোদার শত্রু, তোমার রসূলের শত্রু এবং আল্লাহর কেতাবের শত্রু সে-ই যেন তোমার শত্রু হয়। কিন্তু তাহারাও যেন তোমার দাওয়াত (সত্যের প্রতি আহ্বান) ও দোয়া হইতে বঞ্চিত না হয়। তাহাদের কর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিও কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিও না, এবং চেষ্টারত থাক যেন তাহাদের সংশোধন হয়। কুরআন শরীফে এই সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে ঃ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَىٰ অর্থাৎ "আল্লাহতালা তোমাদের নিকট শুধু ইহাই চাহেন যে, তোমরা সমস্ত মানব জাতির প্রতি আদল বা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার কর। তদুপরি যাহারা তোমাদের কোন উপকার করে নাই তাহাদের প্রতিও এহসান কর। অধিকন্তু তোমরা খোদাতালার সৃষ্ট জীবের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেরূপ সহনিুভূতি আপন ঘনিষ্ট আত্মীয়-যথা মাতা নিজ সন্তানের প্রতি করিয়া থাকেন" *(সূরা নাহল ঃ আয়াত ৯১)।*

কেননা, এহসান বা পরোপকার সাধনে এক প্রকার আত্মপ্রচারের ভাবও নিহিত থাকে এবং উপকারী কখনও আপন কৃত উপকারের জন্য গর্ব করিয়া ফেলে। কিন্তু যে ব্যক্তি মাতার ন্যায় স্বাভাবিক প্রেরণায় পরোপকার করিয়া থাকেন, তিনি কখনও আত্মগরীমা করিতে পারে না। সুতরাং সর্বোচ্চ স্তরের সৎকাজ তাহাই, যাহা মাতার ন্যায় স্বাভাবিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়া করা হয়।

উপরোক্ত আয়াত যে কেবল সৃষ্ট জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাহা নহে, বরং ইহা স্রষ্টার বেলায়ও প্রযোজ্য। খোদাতালার প্রতি 'আদল' (ন্যায়-পরায়ণতা) করার অর্থ হইল তাঁহার নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার আনুগত্য করা। খোদাতালার প্রতি 'এহসান' (উপকার) করার অর্থ- তাঁহার সত্তার উপর এইরূপ বিশ্বাস করা যেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা হইতেছে। খোদাতালার প্রতি 'ইতায়েযিল কুরবা-এর (আত্মীয়সুলভ সহানুভূতির) অর্থ এই যে, তাঁহার উপাসনা যেন বেহেশতের লোভে বা দোযখের ভয়ে করা না হয় বরং বেহেশত-দোযখ নাই বলিয়া ধরিয়া নিলেও যেন তাঁহার প্রতি প্রেম ও আনুগত্যের তারতম্য না হয়।

ইঞ্জিলে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি তোমাকে অভিশাপ দেয়, তুমি তাহার জন্য আশীষ কামনা কর। কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, তুমি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া কিছুই করিও না। এইরূপ ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে তুমি তোমার আত্মার নিকট, যাহা খোদাতালার জ্যোতিঃ বিকাশ স্থল, ব্যবস্থা প্রার্থনা কর। খোদাতালা যদি তোমার মনে এই প্রেরণা দেন যে, এই অভিশাপদাতা করুণার পাত্র এবং আকাশে তাহার উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয় নাই, তাহা হইলে তুমিও তাহাকে অভিশাপ দিয়া খোদাতালার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। কিন্তু যদি তোমার বিবেক তাহাকে ক্ষমার যোগ্য মনে না করে এবং তোমার মনে এই কথার উদয় হয় যে, আকাশে এই ব্যক্তি অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তুমি তাহার জন্য আশীষ কামনা করিও না। যেমন, শয়তানের জন্য কোন নবীই আশীস প্রার্থনা করেন নাই এবং তাহাকে অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন নাই। পক্ষান্তরে কাহাকেও অভিশাপ দিতে তাড়াতাড়ি করিও না। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারণা ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে এবং অভিসম্পাত নিজের উপরই হয়। সতর্কতার সহিত পদবিক্ষেপ কর, খুব বিবেচনা করিয়া কাজ কর এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, কারণ তোমরা অজ্ঞ। এমন যেন না হয় যে, তোমরা ন্যায়বানকে অত্যাচারী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া খোদাতালার অপ্রীতিভাজন হও এবং ফলে তোমাদের সমস্ত সৎকাজ পন্ড হইয়া যায়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২৮-৩১)

২ পাতার পর...

এছাড়া আমাদের অধিকাংশ কাজ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এভাবেও আমরা অর্থ সাশ্রয় করি। একটি প্রকল্প যদি কোন একটি কোম্পানিকে দেওয়া হয় যেখানে ৫০ লক্ষ ডলার খরচ হওয়ার কথা আমরা সেই একই কাজ স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে ১০ লক্ষ ডলারে সম্পূর্ণ করে ফেলি।

সাক্ষাতের শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার কাছে আরও সময় থাকলে আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই কাটাতাম, কিন্তু এখন আমার পরের প্রোগাম রয়েছে। একথা শুনে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান সওয়া এগারোটায় সমাপ্ত হয়।

বায়তুল আফিয়াতের উদ্দেশ্যে যাত্রা

প্রোগ্রাম অনুসারে বারোটা নাগাদ এখান থেকে জামাতের সেন্টার স্টকহোমের বায়তুল আফিয়াতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। প্রায় ত্রিশ মিনিট যাত্রার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) স্টকহোমের সদর জামাত খালিদ মাহমুদ চিমা সাহেবের গৃহে পদার্পণ করেন। সেখানে কয়েক মিনিট অবস্থান করার পর হুযুর আনোয়ার সেখানকার মুবাল্লিগ সিলসিলা কাশিফ মাহমুদ ওয়ারক সাহেবের গৃহে আসেন এবং প্রায় ত্রিশ মিনিট অবস্থান করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) ডক্টর মাহমুদ শর্মা সাহেবের বাড়িতে থেকে জামাতী সেন্টার বায়তুল আফিয়াতে আসেন। জামাতের সদস্যরা হুযুরের আগমণের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কচিকাচাদের দল দোয়া সংবলিত আগমণী গীত এবং নযম পরিবেশন করে। হুযুর আনোয়ার হাত তুলে সকলকে আসসালামো আলাইকুম বলে মিশনের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং যোহর ও আসরের নামায পড়ান।

এরপর প্রোগ্রাম অনুযায়ী স্টকহোম থেকে গোথেনবার্গ-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ হয়। হুযুর আনোয়ার হাত তুলে দোয়া করেন এবং স্টকহোম জামাতের সদর সাহেবের বাড়িতে সাক্ষাত করে বেলা ২টা চল্লিশ মিনিটে গোথেন বার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

স্টকহোম থেকে গোথেন বার্গ শহরের দূরত্ব ৪৮৩ কিমি.। প্রায় তিন ঘন্টা সফরের পর হুযুরের সফরকারী দলটি পথে একটি ক্যাফিটেরিয়ায় কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি দেয়। পুনরায় যাত্রা শুরু হওয়ার পর রাত আটটায় হুযুর আনোয়ার গোথেন বার্গের 'মসজিদ নাসের'-এ প্রবেশ করেন।

অনেক আহমদী সদস্য প্রিয় ইমামের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কচিকাচাদের দল নযম পরিবেশন করে। হুযুর সকলের উদ্দেশ্যে আসসালামো আলাইকুম বলে মসজিদ সংলগ্ন বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

৯:৪৫টার সময় হুযুর আনোয়ার মসজিদ নাসেরে এসে মগরিব ও এশার নামায পড়ান। গোথেনবার্গে সূর্যাস্তের সময় ৯:৩৯টা। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার বিশ্রাম কক্ষে যান।

'মসজিদ নাসের' আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত আহমদীয়া সুইডেনের প্রথম মসজিদ। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) ১৯৭৫ সালে ২৭ শে সেপ্টেম্বর তারিখে সুইডেনের গোথেনবার্গ শহরে এই প্রথম মসজিদের গোড়াপত্তন করেন। হুযুর (রহ.) অনুনয়পূর্ণ দোয়া সহকারে কাদিয়ানের মসজিদ মোবারক থেকে নিয়ে আসা সেই ইঁট রেখে মসজিদের গোড়াপত্তন করেন যা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) দোয়া করে এই মসজিদের গোড়াপত্তন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

এই মসজিদটি একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ৩২৫ বর্গমিটার ভূখণ্ডে বিস্তৃত মসজিদটির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৯৭৬ সালে ২০ শে আগস্ট জুমার দিন হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রা.) এর উদ্বোধন করেন।

মসজিদ নাসেরের জমিটির মোট আয়তন আট হাজার বর্গমিটার। পূর্বে এই জমিটি লীজে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে জামাত এই ভূখণ্ডটি ক্রয় করে নেয়। ১৯৯৯ সালে মসজিদটি প্রশস্ত করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর নির্দেশক্রমে মাননীয় উসমান চীনি সাহেব হুযুরের প্রতিনিধি হিসেবে মসজিদের নতুন ভিত্তি স্থাপন করেন।

এক হাজার চারশ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল এই মসজিদটিতে প্রশস্তীকরণের পর এক হাজারের বেশি নামাযীর স্থান সংকুলান হতে পারে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে পুরুষদের জন্য একটি বিশাল হলঘর, হলঘর সংলগ্ন একটি লাইব্রেরী হল, ডাইনিং হল, কিচেন, পাঁচটি অফিস ঘর এবং থাকার জন্য একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। দ্বিতীয় তলে মহিলাদের জন্য একটি হলঘর, ছোটদের জন্য একটি পৃথক, হলঘর সংলগ্ন দু'টি হল এবং লাজনাদের দফতর রয়েছে। এই ফ্লোরে একটি অতিথিশালাও রয়েছে। এছাড়াও দু'টি অফিস এবং এম.টি.এর স্টুডিও রয়েছে । মসজিদের দু'টি গম্বুজ এবং মিনারাতুল মসীহ সদৃশ একটি মিনারও নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদটি একটি উচুঁ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় দূর থেকে চোখে পড়ে।

রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকায় হুযুর আনোয়ারের সফরের সংবাদ

সুইডিশ ন্যাশনাল টেলিভিশন (Sveriges TV Sydnytt) সংবাদ প্রকাশ করে। এই টেলিভিশন চ্যানেলটি সুইডেনের জাতীয় চ্যানেল। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের স্থানীয় সংবাদের একটি দল হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য ১১ ই মে মালমো এসেছিল। সেই দিনই সন্ধ্যায় এই সংবাদ প্রাদেশিক টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। এতে মসজিদের সৌন্দর্যের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এবং সঙ্গে আশাও ব্যক্ত করেন যে, এলাকার মানুষ এটিকে পছন্দ করবেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের নীতিবাক্য হল "ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আর ইসলামের অর্থ হল শান্তি ও নিরাপত্তা। এতদ্অঞ্চলের মোট ১৩ লক্ষ মানুষের কাছে এই সংবাদ সম্প্রচারিত হয়েছে। ওয়েব সাইটে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে।

" সম্প্রতি মালমোতে একটি নতুন মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে। এর নির্মাণ এবং ব্যয়ভার বহন করছে জামাত আহমদীয়া যারা সকল প্রকারের উগ্রবাদের নিন্দা করে।

আমাদের নীতিবাক্য ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন, যিনি জামাত আহমদীয়াতের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা। বর্তমানে তিনি মসজিদ উদ্বোধনের জন্য সফরে এসেছেন।

Ytrre ringvagen সড়ক পথ ধরে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় অনেকে মসজিদটি দেখেছেন হয়তো।

এর নাম মসজিদ মাহমুদ যা জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফার নামে রাখা হয়েছে। বুধবার তিনি মিডিয়াকে আমন্ত্রণ জানান। এছাড়াও জামাতের অনেক সদস্যও এসেছিলেন। ওয়াসিম আহমদ সাজিদ সাহেব সপরিবারে লোলিও থেকে সফর করে এখানে এসেছেন। তিনি বলেন, " এখানে আসা বড়ই সম্মানের কারণ।'

অনুরূপভাবে ফরিদ আসুফি নিলসুন (সুইডিশ আহমদী মহিলা) তাঁর আধ্যাত্মিক নেতার সঙ্গে সাক্ষাত করতে লোলিও থেকে এসেছেন। তিনি বলেন, ' আজ আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হল হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করা। এটি আমার জন্য ভীষণ আনন্দের বিষয়। যদিও আমি পূর্বেও একবার হুযুরের সঙ্গে লন্ডনে সাক্ষাত করেছি।"

মালমোতে জামাত আহমদীয়ার ৩০০ জন সদস্য রয়েছেন। সুইডেনে এক হাজার এবং সারা পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন।

এটি সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায় যার উৎপত্তি ভারতের পাঞ্জাবে। অন্যান্য মুসলমানদের দৃষ্টিতে নবুয়তের বিষয়ে আকিদার কারণে এরা একটি বিতর্কিত সম্প্রদায় বলে গণ্য। অনেক দেশে এদের বিরোধীতা হয়। পাকিস্তানে তাদের নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়ার অনুমতি নেই।

এই মসজিদটি দেশের দ্বিতীয় আহমদী মসজিদ যা আয়তনে বৃহত্তম।

"এর বিল্ডিংটি খুব সুন্দর আর আমি আশা করি এখানকার বাসিন্দারা এটিকে পছন্দ করবে।" একথা বলেন জামাত আহমদীয়ার সর্বোচ্চ নেতা মির্যা মসরূর আহমদ।

মসজিদ সকলের জন্য উন্মুক্ত

তিনি বলেন, (জামাতের) লক্ষ্য শান্তি ও সম্প্রীতি। জামাত আহমদীয়া সকল প্রকারের উগ্রবাদের নিন্দা করে। এখানে সকলের আসার অনুমতি আছে।

"আমার মতে এটি বহুত্ববাদের স্থান। আমরা কারোর জন্যই নিজেদের দরজা বন্ধ রাখি না।"

একথা বলেন, মালমো জামাতের মুখপাত্র করীম লোন সাহেব।

আযানের ধ্বনি লাউড স্পীকারের মাধ্যমে কেবল মসজিদের মধ্যেই অনুরণিত হয়। এখানে একটি স্পোর্টস হল এবং বিভিন্ন অফিসের জায়গাও রয়েছে।

প্রতি সপ্তাহে জুমার নামাযে খুতবা সুইডিশ এবং উর্দুতে উপস্থাপিত হয়। ব্যয়ভার এবং নির্মাণ কাজ জামাত নিজেই করেছে।

Skanska Dagbladet পত্রিকা ১১ ই মে-এর প্রকাশনায় লেখে-

(এটি একটি দৈনিক পত্রিকা এবং এর পাঠক সংখ্যা ৭৫ হাজার। এছাড়াও অনলাইন সংস্করণে পাঠক সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার।)

উগ্রবাদীদের একবার সুযোগ

দেওয়া উচিত

ইসলামে এমন কোন নির্দেশ নেই যা সহিংসতাকে সমর্থন করে। একথা বলেন মির্যা মসরূর আহমদ, যিনি জামাত আহমদীয়ার সর্বোচ্চ নেতা এবং সারা পৃথিবীতে যার কয়েক মিলিয়নস সদস্য রয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তনকারী দায়েশ সৈন্যদের একবার সংশোধনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

জামাত আহমদীয়ার নীতি হল ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে। ইসলামের মধ্যে এটি এমন একটি ধ্বনি যা অনেকে শোনেন। জামাত আহমদীয়া অনুসারে কুরআনে কোথাও হিংস্রতাপূর্ণ জিহাদের উল্লেখ নেই।

মির্যা মসরূর আহমদ প্রত্যাবর্তনকারী দায়েশ সেনাদের বিষয়ে নিজের অবস্থান বর্ণনা করেন। ইংরেজি পত্রিকা অবজার্ভারকে তিনি বলেছেন, ব্রিটিশ সরকারের উচিত সেই সমস্ত যুবকদের একটি সুযোগ দেওয়া।

এরা আশাহত আর আমি নিজে তাদের হতাশা অনুভব করতে পারি। তাদের একটি সুযোগ দেওয়া উচিত।

এদের তদারকি করা আবশ্যক আর তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা উচিত। তাদের মধ্যে যেন নিজের দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার চেতনাবোধ তৈরী হয়। একথা তিনি Skanska Dagbladet পত্রিকাকে বলেন। তাদেরকে জেলে ঢোকানো আবশ্যক নয়।

কিন্তু সুইডেনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ একটি অপরাধ?

নিঃসন্দেহে, যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে এরা সমস্যা তৈরী করেছে, সেক্ষেত্রে আইন বলবৎ করা জরুরী।

মির্যা মসরূর আহমদ স্বয়ং নিরাপত্তারক্ষীর দল নিয়ে সফর করেন, কিন্তু threat-level সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা সকলে সন্ত্রাসী আক্রমণের কারণে অনিশ্চিত বিশ্বে বাস করছি।

খলীফা পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত যেখানে তাঁকে অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

খলীফা বলেন, আমার সেখানে যাওয়া ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে আর সেখানে আমি জেলেও থেকেছি। তাই আমি আহমদীয়াতের শীর্ষ নেতার পদে আসার পর আমি দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পাকিস্তানে আমার নিজের কথা বলার অনুমতি নেই।

Malmo 24 ১১ ই মে-র প্রকাশনায় লেখে-

মুসলমান পোপ মসজিদ উদ্ঘাটন করবেন: মহান ব্যক্তিত্ব।

৬৫ বছরের খলীফা মির্যা মসরূর আহমদ জামাত আহমদীয়ার শীর্ষ নেতা যা একটি ইসলামিক জামাত। সারা পৃথিবীতে জামাতের প্রায় এক কোটি সদস্য রয়েছে। এর পূর্বে তিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট এবং ব্রিটিশ আন্ডার হাউসেও ভাষণ দিয়েছেন। এছাড়াও মার্কিন কংগ্রেসের একাধিক সদস্যের সামনেও তিনি ভাষণ দিয়েছেন। এখন তিনি শুক্রবার মাহমুদ মসজিদের উদ্বোধন করার জন্য এসেছেন।

ইনি এক মহান ব্যক্তিত্ব আর তাঁর এই সফর অত্যন্ত সম্মানের কারণ। ২০০৩ সালে খলীফা হওয়ার পর সারা পৃথিবী সফর করে ইসলামের শান্তি ও সহিষ্ণুতার বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। এখন সুইডেনের পালা।

মির্যা মসরূর আহমদ সকল প্রকারের উগ্রবাদের কঠোর নিন্দা করেন। তাঁর মতে, পুলিশকে অপরাধ দমনের জন্য আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া উচিত। জামাত আহমদীয়ার সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা হওয়ার বিশিষ্ট মর্যাদার কারণে মার্কিন পত্রিকা ওয়াল-স্ট্রীট জার্নাল তাঁকে মুসলমান পোপ নামে অভিহিত করেছে।

জামাত আহমদীয়া সুইডেনের জন্য, দেশে যাদের সদস্য সংখ্যা এক হাজার এবং মালমোতে দুইশ, এই মসজিদটির নির্মাণ অনেক বড় সফলতা। এর খরচ জামাতের সদস্যরাই বহন করেছে। এর পরিকল্পনা ২০০০ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। মসজিদ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ধাপগুলি সহজ ছিল না।

অনেকে এই বিল্ডিংটিকে মসজিদ নামে ডাকা পছন্দ করবে না, কেননা তারা আমাদেরকে মুসলমান মনে করে না। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সুইডেনে মসজিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী উগ্রবাদীদের পক্ষ থেকে আশঙ্কা রয়েছে আর এর থেকে আমরাও নিরাপদ নই।

Sydsvenskan পত্রিকা তাদের ১১ ই মে ২০১৬-এর সংখ্যায় লেখে-

খলীফা বিল্ডিং পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে মালমো এসেছেন।

শনিবার জামাত আহমদীয়ার নতুন মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে খলীফা মির্যা মসরূর স্বয়ং এসেছেন।

খলীফা মির্যা মসরূর আহমদ জাগেরসস্ট্রোয় অবস্থিত মসজিদ উদ্বোধনের জন্য মালমো এসেছেন। জামাত আহমদীয়ার ভিত্তি রাখা হয় ১৮৮৯ সালে ভারতে। ২০৭ টি দেশে এর সদস্য সংখ্যা এক কোটিরও বেশি।

২৪ মিটার উঁচু ভবনটি নির্মাণের জন্য চার কোটি নব্বই লক্ষ ক্রোনার ব্যায় হয়েছে। এই অর্থ সুইডেনের জামাত নিজে সংগ্রহ করেছে। এর উদ্বোধন শনিবার হবে, কিন্তু মঙ্গলবারেই জামাতের সর্বোচ্চ নেতা মির্যা মসরূর আহমদ মালমোয় অনুষ্ঠানের জন্য এসেছেন।

খলীফা বলেছেন: আমি যখন প্রথমবার এখানে আসি, তখন এটি ফাঁকা মাঠ ছিল। কাল এখানে এসে দেখি একটি সুন্দর বিল্ডিং তৈরী হয়েছে। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য এমন স্থান দর্শন করা তৃপ্তিদায়ক বিষয় যেখানে মুসলমানেরা ইবাদতের জন্য একত্রিত হয়।

আহমদীয়া জামাত নিজেকে শান্তিপ্রিয় জামাত বলে উপস্থাপন করে। কিন্তু মহিলা এবং সমকামিদের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীনপন্থী। খলীফার সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাতকার শুক্রবারের সংখ্যা প্রকাশ করা হবে।

সুইডিশ রেডিও পি.১ ম্যানিসস্কর ওচ ট্রো এবং সেভ্রিগেস রেডিও একোত তাদের ১২ ই মের সম্প্রচারে বলে-

জামাত আহমদীয়ার নতুন মসজিদের উদ্বোধন হল।

আমাদের মোট্টো 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে।'

আজ মালমোতে জামাত আহমদীয়া সুইডেনের দ্বিতীয় মসজিদটির উদ্বোধন হল।

সুইডেনের জামাত আহমদীয়া ছোট্ট একটি দল যার সদস্য সংখ্যা এক হাজার এবং সারা পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে এরা সংখ্যা লঘু।

জামাতে আহমদীয়ার ধর্মবিশ্বাস নাজাত ভিত্তিক। তাদের মতে মুক্তিপ্রাক্ত দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মির্যা গোলাম আহমদ। এই কারণে তারা বিরোধীতার সম্মুখীন হন। এই প্রেক্ষিতে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেম্বারে দন্ডায়মান খলীফা মির্যা মসরূর আহমদ জুমার খুতবা প্রদান করছিলেন। আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান টেলিভিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে সম্প্রচারিত হয়েছে।

Sydsvenskan পত্রিকা তাদের ১৩ ই মে ২০১৬-এর সংখ্যায় লেখে-

(এই পত্রিকাটি দক্ষিণ সুইডেনের সব থেকে প্রমূখ পত্রিকা যা প্রতিদিন এক লক্ষের বেশি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়ও অনলাইনেও এর অনেক পাঠক রয়েছেন।)

উগ্রবাদী এবং সমকামিদের সম্পর্কে সকলের প্রিয় খলীফার সুস্পষ্ট বিবৃতি।

২০৭টি দেশে তিনি এক কোটিরও বেশি মুসলমানদের শীর্ষ নেতা। আমরা জামাতের খলীফা মির্যা মসরূর আহমদের সঙ্গে সাক্ষাত করি। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল জিহাদ, শান্তি এবং করমর্দন প্রসঙ্গে বিতর্ক সম্পর্কে। এছাড়াও ধর্মত্যাগের (শাস্তির) অভিযোগ এবং মুসলমান সমকামিদের বিষয়ে কথপোকথন হয়। হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে মুসলমানদের পোপও বলা হয়। তাঁর মতে এই উপাধিতে অসুবিধের কিছু নেই।

(ক্রমশ:.....)

ইজতেমা রিপোর্ট : মুর্শিদাবাদ জেলা

স্থান- ভরতপুর

আল হামদো লিল্লাহি গত ২১ ও ২২ শে জুলাই, ২০১৮ মসজিল খুদ্দামুল আহমদীয়া জেলা মুর্শিদাবাদ-এর ১৪ তম বাৎসরিক ইজতেমা ভরতপুর আহমদীয়া মুসলিম স্কুল-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জনাব আনোয়ার হোসেন নায়েবব আমীর জেলা মুর্শিদাবাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তেলাওয়াত, আহাদনামা ও নযম পাঠের পর এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এরপর শিক্ষামূলক প্রতিযোগিত আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে তেলাওয়াত, আহাদনামা ও নযম পাঠের পর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব আবু তাহের মণ্ডল সাহেব তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর পুরস্কার বিতরণি পর্ব আরম্ভ হয়। অবশেষে জনাব গোলাম মোস্তফা সাহেব জেলা আমীর কর্তৃক দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

জেলার বিভিন্ন জামাত থেকে মোট ১৬৫ জন খুদ্দাম ও আতফাল এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদদাতা- জিয়াউল হক, জেলা কায়েদ ও নায়েব মোবাল্লিগ ইনচার্জ, মুর্শিদাবাদ।

তাহরিক জাদীদ ও খুদ্দামুল আহমদীয়া

সঙ্কলক-মৌলবী খূরশীদ আহমদ আনওয়ার (মূল-উর্দু)
অনুবাদ-মোরতোজা আলী

পটভূমিকাঃ

ইং ১৯৩৪ সাল- আহমদীয়াতের রাজপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল-ফলক। সেই সময়ে আহমদীয়াতের শত্রু আহরারী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সমস্ত অশুভ দূরভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের সীমারেখায় অতি ক্ষুদ্র আহমদীয়া জামাত শত্রুদের বিদ্বেষপরায়ণ জঘন্য ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছিল। উক্ত সময়ে তাহরীক জাদীদ নামে একটি নতুন আকারে পরিপূর্ণ, চিরস্থায়ী ও নিবেদিতপ্রাণ পুণ্যাত্মাদিগকে দান করা হয়েছিল। যার বিরাট আশীষ ও কল্যাণে আজ আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে পৃথিবীর ২১০ টিরও অধিক দেশ উপকৃত হচ্ছে। আলহামদোলিল্লাহ আলা যালেক।

ধর্মীয় আবরণে সজ্জিত আত্মগোপনকারী ও খাঁটি রাজনৈতিক সংগঠন আহরার পার্টিও যদিও জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তদনুসারে যতই তাঁরা সহযোগিদের পরিধি ও হীনমণ্য শাসকদলের সমর্থনপুষ্ট হতে লাগল, ততই উত্তরোত্তর তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল। যখন নিবেদিতপ্রাণ জামাতের সামনে এমন এক অত্যন্ত কঠিন ও ধৈর্যধারণ করার সময় আসল, তখন পাপিষ্ঠ আহরারীরা বৃহদাকারে আহমদীদের কেন্দ্র কাদিয়ানে অনাধিকার প্রবেশ করে। যেখানে ৯০ শতাংশ আহমদী। সেখানে তারা ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে ঘোষণা করল যে, (নাউজুবিল্লাহ) ঐ সময় দূর নয় যখন ধরাপৃষ্ঠ থেকে মির্যায়ীদের নাম মুছে ফেলে তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। শুধু পাঞ্জাব নয় বরং সারা দেশ থেকে আহমদীয়াতের চিহ্ন এমনভাবে ছেঁটে ফেলা হবে যে, অনুসন্ধান করলেও আহমদী নামধারী কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এমনই এক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) ঐশ্বরিক শক্তিবলে ১৯৩৪ সালের ২৩ শে নভেম্বর ত্যাগ ও উৎসর্গের ২৭ গুরুত্বপূর্ণ দাবি সম্বলিত 'তাহরীক জাদীদ' নামে এক ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিকপূর্ণ আন্দোলন জামাত আহমদীয়ার বন্ধুবর্গের নিকট উপস্থাপিত করলেন, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিজয় ও আহমদীয়াতের বিশ্ব-বিজয় নিহিত রয়েছে।

জাঁকজমকপূর্ণ ঘোষণা:

হুযুর (রা.) এই আশিসপূর্ণ আন্দোলন যথারীতি ঘোষণা করার পূর্ব্বে জামাতের বন্ধুবর্গকে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ইং ১৯৩৪ সালের ১৬ই নভেম্বর জুমআর খুতবায় বলেন- "আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত, আমাদের জন্য এসময়টা এক সঙ্কটপূর্ণকাল। চতুর্দ্দিক থেকে বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে। এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জামাতের মান মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা আপনাদের জন্য একান্ত জরুরী। তবে পাঞ্জাব সরকারের কিছুলোক আমাদের সঙ্গে অসম্মানজনক ব্যবহার করেছে। আহরারিদের চ্যালেঞ্জও রয়েছে। আপনাদের করণীয় এই যে, অসম্মানজনক ব্যবহার ও চ্যালেঞ্জের জবাব দিন। আপনাদের এই উভয় কাজের জন্য যা কিছু কুরবানীর প্রয়োজন তা করুন। এর জন্য আমি আপনাদের কাছে এমন এক কুরবানী করার দাবী করব যা ইতিপূর্বে কখনও করিনি। সম্ভবতঃ এটা প্রথম প্রথম সাধারণ মনে হলেও ভবিষ্যতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। এই জন্য প্রত্যেক আহমদী প্রস্তুত থাকুন। যখন আওয়াজ আসবে, তখন 'লাব্বায়েক' (আমি হাজির ও আপনার সেবায় প্রস্তুত) বলুন।..... আমি আশা করি যে, ধরণের চাহিদার প্রয়োজন হবে। খরচ তার চেয়ে কম হবে না। জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। "

(মোতালেবাতে তাহরীক জাদীদ, পৃষ্ঠা: ৮)

অতঃপর হুযুর (রা.) নভেম্বর জুমআর খোতবায় দাবীর সমস্ত দিক সম্বলিত যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন জামাতের সামনে উপস্থাপন করেন তাহার গৌরবোজ্জ্বল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হুযুর (রা) স্বয়ং নিম্নোক্ত বর্ণনা করে বলেন,

" সমস্ত লোকের নিকট পৌঁছাইতে আমাদের অনেক লোক দরকার, আমাদের অনেক টাকা-পয়সার দরকার, আমাদের সংকল্প ও স্থৈর্যের দরকার আর আমাদের দোয়ারও দরকার যা খোদা তা'লার সিংহাসনকে কাঁপিয়ে দিবে। আর এই সব সমষ্টির নাম 'তাহরীক জাদীদ'।

অলৌকিক ঐশ্বরিক শক্তি:

হুযুর (রা.) এই আবেগপূর্ণ ঘোষণার সাথে ঐশ্বরিক প্রেরণায় জামাতকে সুসংবাদ দান করে বলেন, " আমি আহরারদের পায়ের তলা থেকে মাটি নীচে যেতে দেখছি।" এইরূপে আল্লাহ্ তা'লার অলৌকিক শক্তির ফলে এমন এক পরিবর্তন হল যে, আহরারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। জগতবাসী দেখল যে, যারা ধরা-পৃষ্ঠ থেকে আহমদীয়াতের নাম মুছে ফেলতে চেয়েছিল, তারা অপমান ও কলঙ্কের পঙ্কিল কূপে নিমজ্জিত হল। যারা মিথ্যাশক্তির বলে উন্মত্ত হয়ে কাদিয়ানকে ধ্বংস করার জন্য জোর গলায় চিৎকার করছিল, তাদের কপটাপূর্ণ স্বপ্নের প্রসাদাকে তারা ভূলুণ্ঠিত হতে দেখল।

অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশঃ-

" নিশ্চয় আল্লাহ্ মোমেনদের নিকট তাদের জীবন এবং ধন-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন।"

(সূরা তওবা, আয়াত-১১১)

এরই অনুসরণে শতশত শিক্ষিত আহমদী যুবক সর্ব্বসমক্ষে ধর্ম্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলেন। অন্যদিকে জামাতের অনুরাগীরা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রভুর (হুযুরের) ডাকে সাড়া দিয়ে প্রথম তিন বৎসরে সাতাশ হাজার টাকা দাবীর পরিবর্ত্তে চার লক্ষ (মূল দাবীর পনের গুণেরও বেশি টাকা) সম-সাময়িক খলীফার নিকট উপস্থাপিত করলেন। তাহরীকে জাদীদের এই মাহাত্ম সূর্যের ন্যায় জাজ্বল্যমান।

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাঃ

বিশ্বের সমস্ত ধর্ম্মের ইতিহাস এই কথা বলে যে, বিশ্বাসীদের দৃঢ়পদক্ষেপ ও সহ্যশক্তির পরীক্ষা কখনও শেষ হয় না। শত্রুদের আক্রমণ তাদের উপর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাহরীক জাদীদ দাবীর প্রেক্ষিতে জামাতের অনুরাগীদের আবেগ-উদ্দীপনা দেখে তারা অর্ন্তদগ্ধ হচ্ছিল। সমস্ত আহমদী বিরোধী আন্দোলনকারীরা যারা হাঙ্গামার সময় জঘন্যভাবে অকৃতকার্য হয়েছিল, ইং ১৯৩৭ সালে তারা একবার সংঘবদ্ধ হয়ে জামাত আহমদীয়া সংগঠনের বিরুদ্ধে হাঙ্গামাকারে সোচ্চার হল। তখন মুসলেহ মওউদ (রা.) খোদা-প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুমান করলেন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি জ্ঞাত হলেন যে, খেলাফত আহমদীয়ার সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করা ও তাহরীকে জাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য জরুরী এই যে, আহমদী যুবকদের অন্তর্ভুক্ত রেজাকার (স্বেচ্ছসেবী) সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হউক। যারা জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে যে কোন হাঙ্গামার বিশ্বাসীসুলভ উদ্যম ও সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। অতএব, হুযুর (রা.) -এর নির্দেশে ইং ১৯৩ সালের ৩১ শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে 'মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া'-র ভিত্তি স্থাপিত হল যা আজ আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিমদিগের এক প্রাণবন্ত ও কর্ম্মঠ অংশ বিশেষ।

তাহরীক জাদীদের স্বেচ্ছাসেবী:

এই কর্ম্মঠ সংগঠনের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে তাহরীকে জাদীদের গৌরবোজ্জ্বল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় জরুরী প্রত্যাশামূলক বিষয়ে অবগত করে হুযুর (রা.) ইং ১৯৩৮ সালে ১ল এপ্রিল তারিখে মসজিদ আকসা কাদিয়ানে এক দূরদর্শিতাপূর্ণ জুমআর খুতবা প্রদান করে বলেনঃ-

" বন্ধুরা যদি চান তাহরীক জাদীদ কৃতকার্যতা লাভ করুক, তাহলে এরজন্য আবশ্যক এই যে প্রত্যেক স্থানে নওজওয়ানদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করুন। কাদিয়ানে কিছু যুবকের অন্তরে এই ধরণের ভাবনা চিন্তা সৃষ্টি হল। তারা আমার নিকট থেকে অনুমতি লাভ করে 'মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া' প্রতিষ্ঠা করল। আমি তাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন তাহরীকে জাদীদের মূলনীতির উপর কাজ করার অভ্যাস করে। যুবকশ্রেণীর চরিত্র সংশোধন করে তাদেরকে নিজ হাতে কাজ করার প্রেরণা দান করে। সরল এক অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করার শিক্ষাদান করুন। দ্বীনি (ধর্মীয়) শিক্ষা পঠন-পাঠনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। ঐ সমস্ত নওজওয়ানদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা প্রকৃতপক্ষে কাজ করতে ইচ্ছুক। .....

একথা স্মরণ রাখুন যে, তাহরীক জাদীদের মূলনীতি অনুসারে কাজ করতে হবে। তোমাদের কাজ অবশ্যই বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিহত করা। তোমরা অবশ্যই ইমামের পিছন দিক থেকে সংগ্রাম কর। সুতরাং নতুন কোন 'প্রেগ্রাম (অনুষ্ঠানসূচি) করা উচিত নয়। 'প্রোগ্রাম' তো তাহরীক জাদীদের হবে। আর তোমরা তাহরীকে জাদীদের স্বেচ্ছাসেবক হবে।..... অতএব, তোমাদের উচিত তাহরীক জাদীদ সম্পর্কে আমার বিগত খোতবা সমূহ সমস্ত সদস্যগণকে জ্ঞাত করা। তাদেরকে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 9 Aug, 2018 Issue No.32

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বল তোমরা অন্যজনকে জ্ঞাত কর। তাছাড়া প্রত্যেকে নিজ নিজ মা, বোন ও স্ত্রী-পুত্রদের জ্ঞাত করুন।..... যদি তোমরা এই কাজ কর, তাহলে দুনিয়ায় তোমাদের নাম কেউ জানুক বা না জানুক (এই দুনিয়ায় বাস্তবতা আর কি। মাত্র কয়েক বছরের আয়ু)। কিন্তু খোদা তা'লা তোমাদের নাম জানবেন। যার নাম খোদা তা'লা জানেন, তার চেয়ে বেশি সুখী ও ভাগ্যবান আর কেউ হতে পারে না।"

তাহরীক জাদীদের সক্রিয় সৈন্যদল:-

পনুরায় ইং ১৯৩৮ সালের ১৮ই নভেম্বর তারিখে জুমআর খোতবায় হুযুর (রা.) মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়াকে তাহরীক জাদীদের সৈন্যদল আখ্যায়িত করে এর মহত্বপূর্ণ সুসংবাদ প্রদান করেন।

"মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার নওজওয়ানদের স্মরণ রাখা উচিত, তাদের কাজের ফল শুধু এই যুগের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তথাপি তারা যদি প্রফুল্লচিত্তে ও আন্তরিকতার সাথে কর্ম্মধারা অব্যাহত রাখেন, তাহলে ভবিষ্যতে প্রজন্ম-এর সুফল লাভ করবে। সাহাবাদের (রা) নাম উচ্চারিত হলে আমরা যেমন রাযিআল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু বলে থাকি, তেমনই তাদের নাম নিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মদিগের অন্তর আত্মহারা হয়ে যাবে। এবং আত্মার উন্নতির জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করবে। কিন্তু আবশ্যক এই যে, যে কাজ তারা আরম্ভ করবে, সেটা খুব অধ্যবসা সহকারে হওয়া চাই। যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সে পতিত হয়ে যাবে। তারা শান্তিতে থাকবে যাদের পদযুগল দ্রুত অগ্রসর হবে। মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া তাহরীকে জাদীদের সৈন্যদল। আমি আশা করছি লোক অধিকতর এই সৈন্যদলে যোগ দিয়ে নিজেদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা প্রমাণ করে দেখাবে যে, তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়েছে।"

(আল-ফযল ইং ২৪ শে নভেম্বর, ১৯৩৮)

ইসলামের উদ্যোগী সৈনিক:-

এইরূপে ইং ১৯৪৬ সালে ২৪ শে জুলাই তাহরীক জাদীদের বোর্ডিংয়ে বসবাসকারী ছাত্রদদের দ্বারা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বোর্ডিং স্থাপন করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আলোকপাত করে হুযুর (রা.) বলেন:

" আমি মনে করি এতে (অর্থাৎ বোর্ডিং তাহরীক জাদীদ) ভর্ত্তি থাকা ছেলেরা এমন এক আদর্শ হয়ে ঘরে ফিরে যাক যাতে অন্যেরা দেখে তাদের ছেলেদের কাদিয়ানে শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ জন্মায়। তারা এইরূপে ভূষিত হয়ে এখান থেকে বেরোবে যেরূপে তাহরীক জাদীদ তাদের রাঙাতে চাইছে। আমি মনে করি, এক বছর কেন, এক মাস কেন বরং এক দুই সপ্তাহে এই বোর্ডিং -এ ভর্ত্তি হয়ে যেতে পারে।

.....যেটা তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য, যারা বাইরে থেকে এসে এখানে পড়াশোনা করছে, তারা কম নয় বরং অনেক বেশি। আমরা সুশিক্ষা দিয়ে এমন সৈন্য গড়ে তুলব, যারা ইসলামের জন্য সদা উদ্যোগী হবে। তারা প্রতি প্রান্তর থেকে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করবে। তোমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, তোমাদের বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে ইসলাম ও আহমদীয়াতকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আগুনের মত জ্বলে ওঠা উচিত। ..... কেননা, যখন এই আগুন সৃষ্টি হবে, তখন কোনও কিছুই এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। অতএব ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রেম নিজ অন্তরে সৃষ্টি করুন। পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় লাভের উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখুন।"

(আল-ফযল ইং ২৬ শে জুলাই, ১৯৪১)

তাহরীকে জাদীদের দাবীঃ-

বংশানুক্রমে তাহরীক জাদীদকে সুদৃঢ় করার জন্য খুদ্দামুল আহমদীয়ার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে ইং ১৯৪৬ সালে ১৩ ই ডিসেম্বর হুযুর (রা.) বলেন,

"আমি জামাতের নওজওয়ানদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, তারা তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব বুঝুক। খোদা তা'লার দিক থেকে যে বিরাট দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে সে সম্পর্কে তারা চিন্তা করুন। এই 'জেহাদে' (ধর্ম্মযুদ্ধে) যারা প্রথম থেকে অংশ গ্রহণ করেছেন, তারা পূর্ব্বের চেয়ে বেশি 'কুরবানী' করুন। যে সমস্ত নওজওয়ানেরা কোন কারণবশতঃ এই জেহাদের অংশ গ্রহণ করতে পারে নি, তারা 'ওয়াদা' (অঙ্গীকার) লেখান যথাসম্ভব বেশী কুরবানী করার।"

"সেই দিন আমাদের জামাতে আগত যখন আমাদের মধ্যে এমন লেখক জন্মাবে যারা আমাদের যুগের ঘটনাবহুল বিবরণ লিখবেন।..... তারা সমস্ত শ্রেণীর আহমদীদের বিবরণ লিখবেন যারা কুরবানী করেছে, তাদের নাম অত্যন্ত গর্ব ও সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে। ঠিক একইভাবে স্মরণ করা হবে, যেমন আমরা সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনদের নাম সম্মানন ও গৌরবের সাথে স্মরণ করি। তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম যখন তোমাদের ত্যাগের বিবরণ পড়বে, তখন তাদের ভক্তি শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়ে যাবে।"

"আজ থেকে আঠার বৎসরের উর্দ্ধে প্রত্যেক নওজওয়ানরা এই বিষয়ে অঙ্গীকার করুক যাতে অবশ্যই এই কর্ম্মধারার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আমি জামাতের নওজওয়নাদের এই বিষয়ে বিশেষ করে মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে তারা এই ব্যাপারে নিজ নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করুন, যাতে আগামী কর্ম্মধারা সাফল্য লাভ করতে পারে। অতএব ত্যাগের যত প্রয়োজন হোক, তা তারা অবশ্যই করবেন, কোন নওজওয়ানকে এতে অংশ গ্রহণ না করিয়ে ছাড়বেন না। "

(আল-ফযল ইং ১৩ ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬)

সংগঠকদের যৌথ দায়িত্বাবলীঃ

তাহরীক জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) ২৬ শে নভেম্বর, ১৯৪৩ সালে তাহরীকে জাদীদের দশমবর্ষ পূর্তিতে আনসারুল্লাহ্ ও খুদ্দামুল আহমদীয়া উভয় সংগঠনের উপর দায়িত্ব অর্পন করে ঘোষণা করেন,

" আমি আশা করি আনসারুল্লাহ্ ও খুদ্দামুল আহমদীয়া উভয়েই সময়ের কুরবানী করে লোকের কানে কানে এই আওয়াজ পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ সভা করে আন্দোলন সহকারে চাঁদায় অংশগ্রহণ করাবেন। সমস্ত জায়গায় লোক নিযুক্ত করুন। যাতে সব আহমদীদের নিকট এই আওয়াজ পৌঁছে যায়। আর আন্দোলন করুন যাতে ধর্ম্মের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। বলপ্রয়োগ বা উৎপীড়ন করে নয়। ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে আন্দোলন করুন। অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাউকে বাধ্য করো না। যে ব্যক্তি ভালবাসা ও আন্তরিকতার দ্বারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, সে স্বয়ং আশিসমণ্ডিত হয় এবং ধন-দৌলতে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। কিন্তু কেউ যদি বাধ্য হয়ে এবং কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তার দেওয়া টাকা পয়সায় কোনও আশিস লাভ হবে না। অতএব কাউকে বলপ্রয়োগ দ্বারা এই আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করিয়ে আশিসহীন করো না। তথাপি যদি এধরণের টাকা পয়সা পাও তাহলে তাকে দূরে নিক্ষেপ করে দাও। কেননা এগুলো আমাদের জন্য নয় বরং শয়তানের জন্য। খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে যে টাকা দেওয়া হয়, সে টাকা আমদের। যাহা খোদার সমীপে অর্পন করে আমরা গর্ব অনুভব করি।"

(আল-ফযল ইং ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৩)

এই রূপে ২৫ শে অক্টোবর, ১৯৪৬ সালে জুমআর খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসী সানি (রা.) লাজনা ইমাউল্লাহ্, আনসারুল্লাহ্ ও খুদ্দামুল আহমদীয়া তিনটি সংগঠনকে সম্বোধন করে বলেন-

" কাদিয়ানের মধ্যে ও বিদেশের জামাতে সর্বত্র জলসা উদযাপন করা হউক। লাজনা ইমাউল্লাহ্, আনসারুল্লাহ্ ও খুদ্দামুল আহমদীয়া সবাই পৃথক জলসা করবে। তাহরীক জাদীদের দাবীগুলি ও তার মূলনীতি পুনরুজ্জীবিত করুন। অবিলম্বে জামাতের মানসপটে এই মূলনীতিগুলি সহজবোধ্য করুন। জামাতের মধ্যে সতর্কীকরণ করুন। ক্রমাগত তাহরীকে জাদীদকে পুনরুজ্জীবিত করে তার দাবীগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরে ত্যাগ ও উৎসর্গ করার মনোবৃত্তি গড়ে তুলুন।"

(অবশিষ্টাংশ পরের সংখ্যায়)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.